Amiyabhusan Majumdarer Nirbachito Uponyash:

Likhito Itihash, Moukhik Aakhyan O Swadhinota-Uttor Coochbehar-e

Nagoriker 'Ami'-r Bodh Nirmaan

Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Philosophy, 2019, of the Department of Comparative Literature, Faculty of Arts, Jadavpur University, Kolkata.

Sawon Chakraborty

Supervisor: Prof. Kavita Panjabi, Dept. of Comparative Literature

Class Roll No. 001700203014

Examination Roll No. MPCO194014

Department of Comparative Literature

Jadavpur University, Kolkata

Registration No. 118812 (2012-13)

Declaration

I, Sawon Chakraborty, hereby declare that the contents of this dissertation, Amiyabhusan Majumdarer Nirbachito Uponyash: Likhito Itihash, Moukhik Aakhyan O Swadhinota-Uttor Coochbehar-e Nagoriker 'Ami'-r Bodh Nirmaan has been written by me under the supervision of Professor Kavita Panjabi. No part of this dissertation has been published anywhere or submitted for any other degree/diploma anywhere/elsewhere.

.....

Signature of the Candidate

Date: **.....**

Certificate

Certified that the thesis entitled, Amiyabhusan Majumdarer Nirbachito Uponyash: Likhito Itihash, Moukhik Aakhyan O Swadhinota-Uttor Coochbehar-e Nagoriker 'Ami'-r Bodh Nirmaan, submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same Institution where the work is carried out, or to any other Institution. Two papers out of this dissertation have also been presented by me at two different seminars at Jadavpur University, Department of Bengali and Jadavpur University SYLFF, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Sawon Chakraborty
Roll No. 001700203014
Registration No. 118812 in 2012-2013

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of Sawon Chakraborty entitled, Amiyabhusan Majumdarer Nirbachito Uponyash: Likhito Itihash, Moukhik Aakhyan O Swadhinota_Uttor Coochbehar-e Nagoriker 'Ami'-r Bodh Nirmaan, is now ready for submission towards the partial fulfillment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Comparative Literature of Jadavpur University.

_____	_____	_____
Head	Supervisor & Convenor of RAC	Member of RAC

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অমিয়ভূষণ মজুমদারের সাহিত্য সম্পর্কে প্রথম পরিচয় স্থাপন করবার কৃতিত্ব আমার বাবার। হিরণ মিত্রের ইলাস্ট্রেশান সহ ‘মধু সাধুখাঁ’ উপন্যাসেরই একটা পুরোনো কপি পড়তে পড়তে মনে হয়েছিল, এ তো ইতিহাসের কথাই বলছে, কিন্তু ‘ইতিহাস’ বলতে এতদিন যেমন দেখে এসেছি, তেমনটা নয়, রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত তো নয়ই। সেখান থেকেই প্রাথমিক আগ্রহের সূচনা। সেই বইটির মালিকানা বাবা ও মা— দু’জনেরই। অতএব বলাই বাহুল্য, সেই কারণে এবং আরও যাবতীয় সাহায্যের কারণে আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণার কাজে আমি অনেকের কাছ থেকে সমৃদ্ধ হয়েছি নানা ভাবে। বন্ধু, অগ্রজ ইমন দা’ ও দেবরাজ দা’র সাথে কাজের বিষয়ে আলোচনা নানা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেছে। অরূপজ্যোতি মজুমদার নানা তথ্যের সন্ধান দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। ‘SYLFF’-এর ফেলোশিপ, সাপ্তাহিক আলোচনা--- এই সবকিছু গবেষণা সংক্রান্ত জটিলতাকে সহজ করেছে। ‘SYLFF’-এর প্রাক্তন ডিরেক্টর অধ্যাপক জয়শ্রী রায় ও বর্তমান ডিরেক্টর অধ্যাপক শিবাশীষ চ্যাটার্জী--- দু’জনেই গবেষণায় ‘Interdisciplinarity’-র বিষয়টি নিয়ে আমাকে সচেতন করেছেন। এই গবেষণার কাজটি আমি করেছি অধ্যাপক কবিতা পাঞ্জাবীর তত্ত্বাবধানে। ওঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কোনো শেষ নেই।

সূচিপত্র

ভূমিকা 1

প্রথম অধ্যায়- ‘আমি’র বোধ নির্মাণ: পুঁজি ও উপনিবেশ.....8

দ্বিতীয় অধ্যায়- লিখিত ইতিহাস, মৌখিক আখ্যান ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস..... 29

তৃতীয় অধ্যায়- ব্যক্তি অমিয়ভূষণ: ক্রমনির্মীয়মান ‘আমি’ ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে ‘নাগরিক’-এর ‘ঔচিত্যবোধ’.....44

উপসংহার 54

গ্রন্থপঞ্জী 59

ভূমিকা

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে প্রজার ইতিহাসহীনতা:

কোচবিহারের লিখিত ইতিহাস প্রায় পাঁচশ' বছর সময়কাল জুড়ে বিস্তৃত। কারণ কোচ রাজবংশের শাসনকালও তাই। কার্যত কোচবিহারকে কেন্দ্র ক'রে এ' যাবৎকাল যতটুকু ইতিহাসচর্চা হয়েছে, তার অধিকাংশই রাজার ইতিহাস। বৃহত্তর সমাজ, জনগোষ্ঠী বরাবরই তার বাইরে ছিল। ফলত সেই লিখিত ইতিহাস থেকে এই বৃহত্তর সমাজ, মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিশদ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। রাজার এই ইতিহাসে পূর্বকালের পৌরাণিক ইতিহাস যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক শিক্ষাজাত ইতিহাসচর্চাও, যা ঘটেছে রাজদরবারে-বাইরে-থেকে-কাজ-করতে-আসা ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাত ধ'রে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই বিপুলভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছে রাজবংশ ও রাজবাড়ির বাইরের দুনিয়া। এমনকি দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বৃহৎবঙ্গ' (১৯৩৫ খ্রিঃ) শীর্ষক গ্রন্থে কোচবিহারের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু পরিচয় দিয়েছেন, তাকেও নেহাতই রাজাদের বিস্তৃত বংশতালিকা বললে অত্যুক্তি হবে না। কোচবিহারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুরের অনুরোধে ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কোচবিহারের ইতিহাস' শীর্ষক একটি গ্রন্থ (প্রথম প্রকাশ- ১৮৮২ খ্রিঃ) রচনা করেন, যার বিজ্ঞাপনে তিনি কোচবিহারের অযৌক্তিক, পুরাণ-নির্ভর ইতিহাস প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, 'তৎপাঠে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই অবগত হওয়া যায় না।' কিন্তু এই গ্রন্থেও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আদমসুমারি থেকে প্রাপ্ত হিসেবগুলি বাদে আর তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের ইতিহাস রচনাপ্রকল্পে 'প্রকৃত অবস্থা'-র ধারণায় রাজবংশের বাইরে থাকা মানুষের আখ্যান বরাবরই উপেক্ষিত থেকে গেছে। শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কোচবিহারে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন 'কোচবিহার' (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩ শ্রাবণ) শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত রচনায়। তা থেকে কোচবিহারের বৃহত্তর সমাজের সামান্য কিছু

পরিচয় পাওয়া গেলেও তা যথেষ্ট নয়। রাজার ইতিহাস সহজলভ্য, সাধারণ মানুষের ইতিহাস নেই--- এই সমস্যা শুধু কোচবিহার নয়, পৃথিবীর সকল সমাজই সামন্ততান্ত্রিক যুগ পেরিয়ে আসার কারণে সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ সমস্যা।

কোচবিহার ও ইংরেজ উপনিবেশ:

মোগলরা সম্পূর্ণভাবে কোচবিহার অধিকার করতে না পারলেও ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা প্রাণনারায়ণের আমল থেকেই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে কোচবিহারের সামান্য কিছু পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অঞ্চল (যা দেশভাগের সময় ছিটমহল সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়) নিজেদের দখলে আনে। তবুও শেষ পর্যন্ত কোচবিহার রাজ্যের স্বাধীন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলত ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে যখন ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সনদপ্রাপ্ত হয়, তখন কোচবিহার ব্রিটিশ ভারতের বাইরেই থাকে। তার কিছুদিন পর ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভুটানরাজের হাত থেকে রাজ্যরক্ষার তাগিদে কোচবিহারের নাজির ব্রিটিশদের শরণাপন্ন হ'লে তা করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। ফলত, বার্ষিক করপ্রাপ্তির কারণে ঔপনিবেশিক বাজারব্যবস্থাও এখানে অনুপ্রবেশ করে না, কৃষিকেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থাই থেকে যায়।

কোচবিহারের সমাজকাঠামো: পুঁজি ও সংস্কৃতির বদল

রাজার রাজ্য কোচবিহারে ভারতভুক্তির পূর্ববর্তী সময়কালে একটি নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থা ছিল, যা সামন্ততান্ত্রিক। এই অবস্থা একটি নির্দিষ্ট বাজারব্যবস্থা ও পুঁজির নির্দিষ্ট চরিত্রের কারণেই ক্রিয়াশীল ছিল। এই সময় পর্যন্ত যে সমাজকাঠামো কোচবিহারে ক্রিয়াশীল থাকছে, তা কলকাতা ও ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোচবিহারের বাইরে উপনিবেশের হাত ধ'রে পুঁজির চরিত্র বিবর্তিত হয়ে গেছে অনেক। সেই সূত্রেই পাল্টেছে

অধিবাসীদের শ্রেণির বিন্যাস, এসেছে বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সেখানে সমসাময়িক কোচবিহারের অধিবাসীদের শ্রেণির বিন্যাস সামন্তব্যবস্থার অনুকূল। ইতিহাসলিখন পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ইতিহাসের উত্তরাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে সমসাময়িক কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলাদেশে মধ্যবিত্তের উত্থানের যে কথা বলেছেন, পূর্বোক্ত কারণে সেই ছকে সমসাময়িক কোচবিহারের সমাজকাঠামোকে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছে না। ফলত, কলকাতাকেন্দ্রিক বাংলার ইতিহাস কোচবিহারের ইতিহাসের শূণ্যতাকে পূরণ করতে পারছে না। সাধারণ মানুষের ইতিহাসহীনতার সর্বজনীন ক্ষেত্রে থেকে কোচবিহারের সাধারণ মানুষের ইতিহাসহীনতার প্রসঙ্গ এখানেই অনন্য ও আকর্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

রাজার শাসন শেষ হওয়ার পর ভারতভুক্তির মুহূর্ত থেকে ক্রমশ কোচবিহারের বাজারে ক্রিয়াশীল পুঁজির চরিত্র বদলে যাওয়ার কথা। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো থেকে কোচবিহার যুক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। সাধারণভাবে যে কাঠামোতে পুঁজির সেই বিকশিত চরিত্রই বর্তমান। অর্থাৎ মধ্যবর্তী পর্যায়ে পুঁজির বিকাশের স্তরটি এখানে অনুপস্থিত। আবার, কোচবিহার একেবারে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সংলগ্ন হওয়ায় সেই একই সময় থেকে অভিবাসী (migrant) মানুষই এখানকার সংখ্যাগুরু নাগরিক হয়ে উঠতে শুরু করেন। অভিবাসী হয়ে আসবার সূত্রে অভিবাসনের পরমুহূর্তে তাদেরও পরিচিতি ও ঔচিত্যবোধে পরিবর্তন ঘটেছে।

পরিচিতি: তিন বিন্দুর সহাবস্থান

ভারতভুক্ত হওয়ার পর থেকে কোচবিহারের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় পরিচিতির তিনটি অবস্থান বা বিন্দু তৈরি হ'ল।

ক. রাজার আমলের নির্দিষ্ট পরিচিতির ঐতিহ্য

খ. যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় তৈরি হওয়া নতুন শ্রেণিবিন্যাস ও নির্দিষ্ট পরিচিতি

গ. অভিবাসী সম্প্রদায়ের আত্ম অনুসন্ধান ও নির্দিষ্ট পরিচিতি

সাধারণ মানুষের ইতিহাসের শূণ্যতার বিপ্রতীপে নিজের পরিচিতি সন্ধান ও নির্মাণ করছে মানুষ। তাই নিজেদের আঞ্চলিক ও সামাজিক ইতিহাসের শূণ্যতার বিপ্রতীপে সচেতন বা অসচেতনভাবে কোচবিহারের অধিবাসীরা তাঁদের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় নির্মাণ করেছেন কল্পিত এক অতীতকে। সাংস্কৃতিক চর্চাকে প্রত্যেক জনগোষ্ঠী ব্যবহার করে স্মৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে (as a site of memory)। তার মধ্য দিয়ে এই ইতিহাস নির্মাণের প্রচেষ্টা যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সচেতন ক্রিয়া, তা একেবারেই নয়। মানুষ তার নিজের স্মৃতি ও তার 'collective memory'-র মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। এই সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে এই তিনটি অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাস বিষয়ীবত্তা-নির্ভর (Subjective) ইতিহাস। এই বিষয়ীবত্তা তৈরি হওয়ার সামাজিক কারণ রয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার এমন একজন সাহিত্যিক, যাঁর সাহিত্যচর্চায় ধারাবাহিকভাবে এই অঞ্চলের অতীত-সময়ের কথা এসেছে। এই আলোচনার ক্ষেত্রে তার দু'টি পরিচিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অভিবাসী এবং কোচবিহারের বাসিন্দা। তিনি নিজে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাহিত্য রচনা করলেও তাঁর অনেক রচনাই অতীতকালকে কেন্দ্র ক'রে রচিত। সাহিত্যে এই ইতিহাসকল্পনা সর্বাংশেই সচেতন প্রক্রিয়া। অমিয়ভূষণ তাঁর তিনটি উপন্যাস 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৬৮ খ্রিঃ), 'রাজনগর' (১৯৭২-১৯৭৪ খ্রিঃ) ও 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৭৮ খ্রিঃ)-তে কথা বলেছেন কোচবিহার

অঞ্চলকে নিয়ে। রাজনগরে কোথাও সরাসরি তার উল্লেখ না থাকলেও বেশ কিছু চিহ্ন থাকে, যার মধ্য দিয়ে কোচবিহারের কথা মনে পড়বে বারবার। অমিয়ভূষণের এই অতীত সন্ধানকে তাঁর স্বতন্ত্র প্রবণতা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। তা একটি দেশীয় রাজ্যে অভিবাসন নেওয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা, কোচবিহারের বিষয়ীবত্তা-নির্ভর ইতিহাস সন্ধান ও নতুন পরিচিতির রূপরেখাকে বুঝতে গেলে যাকে আলাদা ক'রে গুরুত্ব দিয়ে দেখতেই হবে।

গবেষণার প্রশ্ন:

ইতিহাসচেতনা ভারতভুক্তির পরবর্তীকালে স্বাধীনতা-উত্তরকালের কোচবিহারে নাগরিকের আত্মপরিচিতিকে কীভাবে নির্মাণ করছে?

গবেষণার উদ্দেশ্য:

ক. অভিবাসী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ইতিহাসচেতনা বা তার আভ্যন্তরীন কোনো দ্বন্দ্ব কোনো ভিন্ন জাতীয়তাবোধের কথা বলে কি না, যা পরবর্তীকালে এই রকম একটি অঞ্চলের পৃথক রাজ্যের দাবির মূলে কাজ করেছে --- তা দেখা

খ. এই ধরণটি রাজার ইতিহাসের বিপ্রতীপে কোনো বিকল্প দাঁড় করাতে পারছে কি না, তা দেখা

গ. তিনটি বিন্দুর যৌথতায় যে ইতিহাসবোধ তৈরি হয়েছে, স্বাধীনতা-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে কোচবিহারের অধিবাসীদের তা কোন ধরণের ঔচিত্যবোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তা দেখা

গবেষণার পদ্ধতি সংক্রান্ত:

ক. ক্ষেত্রসমীক্ষার মধ্য দিয়ে মৌখিক আখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রাথমিক তথ্য জুগিয়েছে।

খ. মৌখিক ইতিহাসের সঙ্গে লিখিত ইতিহাস ও নির্বাচিত উপন্যাসগুলিকে মিলিয়ে প'ড়ে নানা বিপরীত তর্ক, নানা স্মৃতিধৃত চিন্তাসূত্রকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. গবেষণার প্রথম ধাপে তথ্যের একটি স্তর আছে। তা থেকে যুক্তির মাধ্যমে তথ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সম্পর্কই নির্মীয়মান বিষয়ীবত্তা-নির্ভর ইতিহাস ও মানুষের পরিচিতির আভ্যন্তরীন সম্পর্কটিকে বুঝবার ক্ষেত্র তৈরি করবে।

গবেষণাপত্রের অধ্যায় বিভাজন:

ক. 'আমি'র বোধ নির্মাণ: পুঁজি ও উপনিবেশ

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কীভাবে পুঁজির চরিত্র পরিবর্তনের পাশাপাশি 'আমি'-র বোধ পরিবর্তিত হচ্ছে, এই 'আমি' বিভিন্ন বাজারব্যবস্থায় কীভাবে 'অপর'-কে দেখছে তা নিয়ে। সেই সূত্রেই এই অধ্যায়ে এসেছে উনিশ শতকে নির্মিত জাতীয়তাবাদ কীভাবে অপরায়িত করে, সেই প্রসঙ্গ।

খ. লিখিত ইতিহাস, মৌখিক আখ্যান ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস

কোচবিহারের লিখিত ইতিহাসের সাথে অমিয়ভূষণ মজুমদারের নির্বাচিত উপন্যাসগুলির সম্পর্ক, মৌখিক আখ্যানের সাথে লিখিত ইতিহাস ও উপন্যাসগুলির সম্পর্ক এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে দেখতে চাওয়া হয়েছে কীভাবে এরা একে অপরকে গ্রহণ ও বর্জন করে, কেনই বা করে, এ কথা।

গ. ব্যক্তি অমিয়ভূষণ: ক্রম-নির্মীয়মান 'আমি' ও স্বাধীনতা-উত্তরকালে 'নাগরিক'-এর 'ঔচিত্যবোধ'

অমিয়ভূষণ তাঁর 'উদ্বাস্তু' সত্তার কারণে ব্যক্তি হিসেবে এই অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে অতীত উপন্যাসে নির্মিত হয়, তার বিষয়ী বা 'Subject' তিনি নিজে। সেই সূত্রেই 'Subject'-এর গুরুত্ব এই আলোচনায় অনিবার্য। এই অতীতবোধ কোন 'আমি'-র বোধ নির্মাণ করছে, যা স্বাধীনতা-উত্তরকালের ভারতবর্ষের এক জেলা কোচবিহারের 'নাগরিক'-এর ঔচিত্যবোধ প্রসঙ্গে দিকনির্দেশ করবে, তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

প্রথম অধ্যায়

‘আমি’র বোধ নির্মাণ: পুঁজি ও উপনিবেশ

উনিশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের যে সকল ধারণা নির্মিত হয়, তার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসটি প্রাক্-উপনিবেশ এক সময়ের কথা বলে, যেখানে মধু ক্রমাগত এক আত্ম-অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে। মধুর নিজের পরিচিতি সন্ধানের মধ্য দিয়ে 'আমি'-র যে বোধ নির্মিত হয়, তা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে তৈরি হওয়া 'আমি'-র বোধ থেকে চরিত্রগতভাবে পৃথক। এই প্রবন্ধে সেই পার্থক্যগুলি দেখানো হয়েছে ও তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসের (পত্রিকায় প্রকাশ: ১৯৬৮ খ্রিঃ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ: ১৯৮৮ খ্রিঃ) আখ্যান আবর্তিত হয়েছে 'সাতিশয় হারামজাদা' মধুর দার্শনিক 'সংকট'-কে ('crisis' অর্থে) কেন্দ্র ক'রে। সেই সূত্রেই আখ্যানে এসেছে 'বলা' চরিত্রটি। আখ্যানের কথক এই চরিত্রটিকে একটি ঐতিহাসিক চরিত্র- রাল্ফ্ ফিচ ব'লে মনে করেছেন[1], ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে যিনি ভারতবর্ষে ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এসে বছর সাতেক এই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে উনিশ শতকে ঔপনিবেশিকতার হাত ধ'রে জাতীয়তাবাদের ধারণা উঠে আসে। 'আত্ম' এবং 'অপর'-এর পারস্পরিক বৈরিতার দ্বিত্ব সম্পর্ক তৈরি করাই ছিল যার মূল কাজ। যে দুই পারস্পরিক বৈরিতার সম্পর্ক তৎকালে নতুন ক'রে উঠে আসে, তা মুসলমান-হিন্দু সম্পর্ক এবং ইংরেজ-ভারতীয় সম্পর্ক।

[1] 'প্রিয় পাঠিকা, এখানে একটা কথা বলা দরকার। বুঝতে পারছি ঘটনাটা ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দের।
এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ পর্যটক রাল্ফ্ ফিচ্ নিজেই। ইতিহাসের চরিত্রই বটে'।
(মজুমদার ১৯৮৮, ১০)

এখন, 'আমি'-র বোধ নির্মিত হওয়ার পাশাপাশি একই সঙ্গে তৈরি হ'তে থাকে 'অপর'-এর ধারণা। যে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন নিজের পরিচিতি সম্পর্কে সচেতন হ'তে থাকে, তখন কার্যত সমাজে তার বা তাদের ভূমিকা কী হবে, সামাজিক উপাদান হিসেবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কী হবে, অর্থাৎ তার বা তাদের কী করা উচিৎ ও কী করা উচিৎ নয়, এই ঔচিত্য সম্পর্কে সচেতন হয়। এই ঔচিত্যবোধই তার/তাদের সামগ্রিক ক্রিয়াকে নির্ধারণ করে। এই ঔচিত্যবোধে যার সাথে তার ভিন্নতা তৈরি হয়, সে-ই 'অপর'। 'বলা'-র সঙ্গে মধুর কথোপকথনে উঠে আসে এক সংকট, যার তাড়নায় মধু নিজেকে খুঁজতে চায়, বুঝতে চায় তার 'আমি'-র চেহারাটিকে। সেখানে সে 'অপরায়িত' করবার এক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। তার বিপ্রতীপ অবস্থানে থাকে বলা। কিন্তু এই অপরায়িত করবার প্রক্রিয়াটি জাতীয়তাবাদী ভাবনা যেভাবে অপরায়িত করে, তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ উপনিবেশ থাকাকালীন উনিশ শতকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাতীয়তাবোধের বিভিন্ন ধারণা উঠে আসতে থাকে। কেউ কেউ হিন্দু জাতীয়তার[2] কথা বলেন, কেউ ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির কথা

[2] বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির ইতিহাসহীনতা প্রসঙ্গে যে আক্ষেপ করেন ও বাহুবলের যে ইতিহাসরচনাপ্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন, সেই ধারায় পরবর্তীতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব। এই মতাবলম্বীদের দাবি, ভারতবর্ষের গৌরবময় ইতিহাস, যে ইতিহাস কেবলমাত্র হিন্দুদের, তার পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা হিন্দুদের দখলে নিতে হবে। অর্থাৎ হিন্দুরাই ভারতবর্ষের মূল এবং প্রকৃত লোক, বাকি সবাই 'অপর', বাইরে থেকে এসে তারা দেশকে শাসন এবং শোষণ করছে। এই মতবাদের কেন্দ্রে রাখা হ'ল সপ্তদশ শতকের মারাঠা রাজা ছত্রপতি শিবাজীকে। বাইনারি সম্পর্কে তার বিপ্রতীপে ঔরঙ্গজেব, যিনি মুসলমান শাষক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটির ভূমিকা, বিজ্ঞাপন এবং চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই বাইনারিকে পরবর্তীতে 'বহিরাগত' সূত্রে ইংরেজ বিরোধিতার কাজে লাগানো হলেও বা ধর্ম ও হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও এক উন্নত ও প্রকৃত মানবতার কথা বললেও হিন্দু-মুসলমান বাইনারি কার্যত উপমহাদেশের অন্যতম সমস্যা হয়েই থেকে যায়।

বলেন[3], কেউ বলেন 'nation-in-the-making', উঠে আসে সেনা-নির্ভর জাতি গঠনের ভাবনা[4]। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'আমি'-র যে ধারণা নির্মিত হচ্ছে, তাতে 'আমি' 'অপর'-এর তুলনায় মহৎ এবং 'আমি'-ই শ্রেষ্ঠ। 'জাতীয়তাবোধ' – এই নির্দিষ্ট শব্দবন্ধের মাধ্যমে কার্যত এই ধারণাটিকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। 'আমি'-র ধারণাতে যে আরও অন্য মাত্রা থাকতে পারে, তাকে অস্বীকার করে জাতীয়তাবোধ দ্বারা পুষ্ট এই ধারণা। জাতি হিসেবে তা একটি অখন্ডের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। জাতীয়তার এই যে কয়েকটি ধরণ, সেগুলি প্রত্যেকটিই নির্মিত হয়েছে একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে বৃহৎ বিদেশি পুঁজি প্রধান শত্রু, তার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে নিজেদের দাঁড় করাতে হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট, একক বিন্দুতে। ফলত এখানে 'আমি'-র ধারণা একমাত্রিক, 'আমি'-র অন্য মাত্রাগুলিকে তুলে ধরবার সুযোগ এই নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নেই।

'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসের আখ্যানের মুখ্য বিষয় ভিন্ন হ'লেও ঘটনাক্রমে এখানে এসেছে কামতাপুরের প্রসঙ্গ। বেনে মধু কামতাপুরের উপর দিয়ে বয়ে চলা ধল্লা[5] নদীতে তার নৌকা ভাসিয়ে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তার যে যাত্রা শুরু করে, সেই যাত্রার বিবরণ-সূত্রেই বৃহৎ কামতা অঞ্চলের অতীত-রূপটি উপন্যাসে

---

[3] রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধি জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে তাঁদের মতামতে যে মূলভাবটির কথা বলেন, তা বৈচিত্র্যের মধ্যে সহাবস্থানে থাকার শ্রেষ্ঠত্ব। 'অপর'-এর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবার উদারতা।

[4] আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন করার ভাবনা এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে যে নতুন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন, তা সেনা-নিয়ন্ত্রণে থাকা জাতি।

[5] 'এটা অবশ্য গঙ্গা নয়, ধল্লা নাম।...মদু ভাবলোঃ এ তো ভারি কৌতুকের—কেউ-কেউ যেমন অন্নকে অর্ন লেখে আর বর্ণকে বলে বন্ন তেমন এ-নদীকেও কেউ-কেউ ধরলা বলে। আসলে সম্ভব ধবলাশ্বেতা থেকেই এই নাম।নদীর স্রোত থেকেই তার মনে এলো গত এক মাসে তাঁরা ধুবড়িকে বাঁয়ে রেখে রাঙামাটি পর্যন্ত গিয়েছিল। বলা বলে রুনতি। তারপরে আবার ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ধুবড়িকে (বলা বলে দুপুরি, হয়তো সে ঠিকই বলে), হ্যাঁ ধুবড়িকে ডাইনে ফেলে দক্ষিণে এসেছিল তারা। এখন ধল্লা বেয়ে কামতাপুরের দিকে চলেছে তারা। ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের পরে এখন ধল্লা। পূর্বস্থলি থেকে কামতা, দক্ষিণ থেকে উত্তর।" (মজুমদার ১৯৮৮, ৩-৪)।

এসেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামতা অঞ্চলের অংশবিশেষে একধরণের বিশেষ জাতীয়তাবোধ নির্মিত হয়, যার কেন্দ্রে রাখা হয় একটি ঐতিহাসিক চরিত্রকে। তিনি কোচ রাজবংশের একজন, চিলারায় বা শুক্লধ্বজ, মহারাজা নরনারায়ণের ভাই। তাঁর সময়কাল ১৫১০ খ্রিঃ থেকে ১৫৭৭ খ্রিঃ। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন আঞ্চলিক ইতিহাস লিখিত হচ্ছিল, তখন অতীতের কিছু প্রাদেশিক চরিত্রকে গ্রহণ করা হচ্ছিল জাতীয়তাবাদের স্তম্ভ হিসেবে, যে ইতিহাস গৌরবময় অধ্যায়ের ইতিহাস। কারণ তাতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব গোটা মানব সমাজের নয়, নির্দিষ্টভাবেই গোষ্ঠীকেন্দ্রিক। শ্রেষ্ঠত্বের এই দাবিই উনিশ শতকে নির্মিত জাতীয়তাবাদের মূল কথা। ফলত জাতীয়তাবাদী চেতনা যাকে অপরায়িত করে, তাকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখে। ‘অপর’ এখানে ‘আমি’-র নিচে, অর্থাৎ হেয় হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাওয়ার ভাবটি প্রধান।

এই বৃহৎ কামতা অঞ্চলের পরিচিত জাতীয়তাবাদী চেহারাটি (যার কেন্দ্রে আছেন চিলারায়) এই অঞ্চলের লিখিত ইতিহাস থেকে তথ্য সংগ্রহ ক’রেই ঔপনিবেশিক আদলের সেই দ্বিত্ব সম্পর্ক মেনে নির্মিত হয়েছে।[6] ফলত জাতীয়তাবাদী ইতিহাস যেভাবে ‘আমি’-কে দেখতে শেখায়, তা একটি নির্দিষ্ট ধরণের ‘আমি’, যে ‘আমি’ ‘গৌরবময় ইতিহাস’-এর স্মৃতির ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু ‘মধু সাধুখাঁ’ উপন্যাসের আখ্যানের সময়কাল চিলারায়ের জীবৎকালের (১৫১০ খ্রিঃ- ১৫৭৭ খ্রিঃ) প্রায় সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে কোনো কথা আখ্যানে থাকে না। স্পষ্টতই তা এই ইঙ্গিত দেয় যে, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ‘মধু সাধুখাঁ’-র সময়কে নির্মাণ

[6] ভগবতীচরণের রচনাটি ও দীনেশচন্দ্র সেনের ‘বৃহৎবঙ্গ’ সহ প্রতিটি রচনা, যা কোচবিহারের রাজবংশের পরিচয় দিচ্ছে, তাতে স্পষ্টত উল্লেখ রয়েছে, মহারাজা নরনারায়ণের ভাই চিলা রায় বা শুক্লধ্বজের সেনাপতিত্বেই কামতার সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তারিত হয় এবং নরনারায়ণের রাজত্বে দেশে প্রকৃত সুশাসন ছিল। বহিঃশত্রু বলতে এখানে মুসলমান।

করা হবে না, এই আখ্যানের ভিন্ন কোনো রাজনীতি থাকবে। এই রাজনীতিই কার্যত লিখিত ইতিহাসের একমাত্রিক আখ্যানের বাইরে থাকা দর্শনকে খুঁজতে চাইবে।

'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে মধু তার নৌকায় কেবল ব্যবসার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করে না। বলা'র সাথে সে'ও দেশ দেখে। জমি বা মাটির সাথে সেই অঞ্চলের সংস্কৃতির সম্পর্ক দেখে তাদের দু'জনের নিজেদের সংস্কৃতির নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। সেই প্রতিক্রিয়াই বৃহদাংশে নিয়ন্ত্রণ করে এদের দু'জনের কথোপকথনকে। আলোচ্য উপন্যাসের আখ্যানকে এইভাবে দেখলে এই কথা স্পষ্ট, অমিয়ভূষণ প্রাক্-উপনিবেশকালে গিয়ে খুঁজতে চাইছেন অঞ্চলের সঙ্গে 'আমি'-র সম্পর্ককে। কিন্তু কেন তিনি আখ্যানের কাল হিসেবে বেছে নিচ্ছেন প্রাক্-উপনিবেশ সময়কে? বিদেশী পুঁজি, তার শোষণ--- এই ব্যাপারগুলি তখন ধারণার বাইরে। আখ্যানের কাল এমন সময়ের কথা বলে, যেখানে চরিত্রগুলির বিদেশি পুঁজিকে কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে, তা নিয়ে ভাবতে হয় না। মধুর সময়ে বাণিজ্যব্যবস্থায় বহিরাগত কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।[7] ফলত উৎপাদক, বিক্রেতা, ক্রেতা--- এই সম্পর্কগুলিও অন্যভাবে ক্রিয়াশীল। বিদেশি পুঁজির ক্ষেত্রে যে ক্রেতা, সে কেবল ক্রেতাই। উৎপাদকের অবস্থানেও সে যদি কখনো থেকে

[7] চেকাখাতার যে হাটের পরিচয় এখানে থাকে, তা এইরকম—
"হাটটা জমে দুপুরের পরে। কিন্তু এখনই দেখো ভিড়। যারা হাট ধ'রে সারা বছর প'ড়ে থাকে তাঁদের খান কয়েক পাকা পোক্ত খোড়ো চৌরী। ওপাশে দক্ষিণ থেকে নৌকায় আসা হাড়িপাতিল তিজেলের মঠ উঠেছে যেন কুমোরদের। এদিকে ছাতনাগাছের নিচে পাশাপাশি দাঁড়ানো অনেকগুলো বেঁটে-বেঁটে ভুটিয়া ঘোড়া, লম্বা লেজ আর কপালে ঘাড়ে হাঁটুর গাঁটে লম্বা-লম্বা চুল। প্রস্রাবের গন্ধে এগোবে কী? তার কাছেই ছোটো একটা ধানের স্তূপ। কেনবার আগে চিটেতে ফুঁ দিয়ে পরখ করছে একজন। আর এর পাশ দিয়ে এগোলে আরেকটু ভিতর দিকে সেই দোকানগুলো, যেখানে এন্ডি আর ভোটকম্বল সাজানো আছে, চমরীর লেজ পাবে, যাতে চামর হয়, আর মাঝে-মাঝে কস্তুরী—মৃগনাভি যার নাম"। (মজুমদার ১৯৮৮, ৫২-৫৩)

থাকে, তা শেষ পর্যন্ত সে ক্রেতার অবস্থানে থাকবে ব'লেই। তাই জাতীয়তাবাদ কেবল শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখা 'আমি'-র কথাই বলতে পারে।

জাতীয়তাবোধের পূর্বোল্লিখিত যে কয়েকটি ধরণ, তার একটি প্রধান সমস্যা হ'ল- সমাজ-কাঠামোতে উপরিতলে থাকা বিষয় এগুলি। নির্দিষ্ট যে অঞ্চলের জাতীয়তার কথা এরা বলতে চায়, সেই অঞ্চলের অর্থনীতি নিয়ে কোনো বিশ্লেষণ এতে থাকে না, সবকিছুর উর্ধ্বে একটি আবেগকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় এই চিন্তাধারা। 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসটি তার অতীত কল্পনাপ্রকল্পে এই শূণ্যতাকে চিহ্নিত করে। ফলত সেখানে ভিন্ন নীতিতে 'আমি'-র বোধ নির্মিত হ'তে থাকে। দেশীয় পুঁজির ক্ষেত্রে, যে পদ্ধতিতে মধু বাণিজ্য করে, তাতে যেহেতু পণ্য যেখানে উৎপাদিত হবে, সেখানেই বিক্রি হবে, ফলত উৎপাদক ও ক্রেতার নিজেদের অবস্থান বিনিময় করার সুযোগ থেকে যায়। এরা পরস্পর অবস্থান বিনিময় করে। ফলত এই পরিস্থিতিতে 'আমি'-র ধারণা কোনোভাবেই একমাত্রিক হ'তে পারে না। ফলত এ'ক্ষেত্রে কাউকেই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কাউকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না, ঔপনিবেশিক সময়কালে যা সম্ভবপর হয়েছিল। কাজেই 'আমি'-র ধারণাটাই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিপুষ্ট 'আমি'-র ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। তাই বলাকে বিপ্রতীপে রেখে 'আমি'-র বোধ নির্মাণ করতে গিয়ে যেভাবে নদীর দুই দিকের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রসঙ্গ আসে, তাতে মধু নিজেকে কোনো একক অবস্থানে রাখতে পারে না। মধুর 'নিজভাষা রাঢ়ী', 'নিবাস পূর্বস্থলী'। অতএব, তার আঞ্চলিক পরিচিতি নির্দিষ্ট। কিন্তু সে বাইরের অঞ্চল থেকে সেখানে বাণিজ্য করতে আসা একজন হিসেবেই কেবল এই অঞ্চলগুলিকে দেখে না, এই অঞ্চলগুলির আচার প্রসঙ্গে বলার সাথে তার কথোপকথনের কালে 'আমি'-র অন্তর্গত ক'রে ফেলে তাদের সংস্কৃতিকেও। ফলত কামতাপুরের ওপর দিয়ে যখন তার নৌকা বয়ে চলে, নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যখন সে সতীদাহ দেখে এবং বলার

সাপেক্ষে সতীদাহকে নিজের সংস্কৃতি হিসেবে দেখে, তখন তো আসলে অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিকেই নিজের ক'রে দেখে! এই কেন্দ্রে কি কেবল ধর্ম? কোনোরকমের ব্যবহারিক কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাতিরেকে 'অপর' 'আমি'-র অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। যখন 'অপর'-কে 'আমি'-র অনিবার্যভাবে প্রয়োজন, তখনই 'অপর' ও 'আমি' অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হ'তে পারে। এই ক্ষেত্রেও তাই। 'দক্ষিণ থেকে সে আনে চুয়াচন্দন, এলাইচি-লবঙ্গ, শান্তিপুরী শাঁখের চুড়ি, উত্তর থেকে নিয়ে যায় কস্তুরী আর পোস্তদানা, যষ্টিমধু এন্ডি আর ভোটকম্বল, কখনো সন্তরা আর আমলকী'।[৪] ফলত তার জীবিকার নিরিখে দক্ষিণ ও উত্তর—এই দুইই তার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ, দুই স্থান থেকেই তার বাণিজ্য পুষ্ট হয়। অতএব, তার পক্ষে এই স্থানকে 'আমি'-র বাইরে রাখা অসম্ভব। 'মদু সা অন্যূন চারটে ভাষায় কথা বলে। নিজভাষা রাঢ়ী ছাড়াও, সংস্কৃত, গৌড়ের ভাষা ফারশি, হার্মাদি-মগাই'। (মজুমদার ১৯৮৮, ২) এত রকম ভাষা তাকে জানতে হয় ভিন্ন ভিন্ন 'অপর'-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রে। সেই সূত্রেই সেই 'অপর'-এর সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞাত হয় সে। কৌতূহলী হওয়ার অবকাশ সে পায়, বহুধাবিভক্ত হওয়ার সুযোগ সে পায় বিপ্রতীপে কোনো অসম শত্রু নেই ব'লে, যে মধুর বাজার দখল নেবে। বলাকে যেভাবে অপরায়িত করে মধু, তাতে থাকে কৌতূহল, সে যেন আবিষ্কার করে অন্য ধরণের মানুষকে। উপন্যাসের কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন—

> বলা পাশে ব'সে লিখছিল আর বদর মদুর হাত-পা টিপছিল। তখন লক্ষ করেছিল মদু, বলা তার লেখার মাথায় অঙ্ক বসিয়েছে। মদু বললে- ধুশ্ শালা, ফিরিঙ্গি, ই পন্দরশো আট শক, পন্দরশো ছিয়াশি লিখো কেনে? তখন বলা নিজের বুকের উপরে বার দুই ঢেড়া কেটে যা বলেছিল তা এই যে সেটা পনরোশো আট শক হতে পারে কিন্তু তাদের প্রভুর পনরোশো ছিয়াশি বটে। (মজুমদার ১৯৮৮, ৬)

[৪] (মজুমদার ১৯৮৮, ১৪-১৫)

> প্রিয় পাঠিকা, আর এই ইংরেজ পর্যটককে দেখুন, যেমন মদু দেখে থাকে। মাথায় শাদার আঁশ মেশানো বাদামি চুল। রোদে- জলে লালচে হ'য়ে- ওঠা সফেদ শাদা রঙ। চোখে কী ক'রে দেখতে পায়? আশ্চর্য! আমার তোমার চোখের যেখানে মণিটা সে-রকম জায়গায় ওর চোখে খানিকটা সবজে-কটা রঙের ছোপ। মদুর পাল্লায় প'ড়ে ওকে এখন স্নান করতে হচ্ছে। জামা-জোব্বা ছাড়তে হয়। এখন যেমন ধুশ মটকার পাজামা আর পিরহান প'রে আছে।
>
> সেই অগম ভুটান পর্যন্ত যেতে চায়। কী লাভ? বাণিজ্য করবে? আ মরি, সে তো চেকাখাতার আরঙেই পাওয়া যায়। যা চাও, যত নিতে পারো। ভোটকম্বল, কস্তুরী আর চমরীর লেজ, আর সময়কালে সন্তরা। না কি দেশ দেখা?
>
> সেদিক দিয়ে সাহস আছে বলতে হবে। সাতসমুদ্দুর পেরিয়ে এসেছে দেশ দেখতে। অন্যদিকে জ্ঞানগম্যি দেখো- গোটা পৃথিবী নাকি দু-ভাগে ভাগ করা: এক ভাগে পর্তুগিজ, আরটি ইস্পেনি হার্মাদদের। এদের, অর্থাৎ আংলিশদের, ভাগে নবডংকা। মদু সা শুনে হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিল। মাইরি, বলা, আমাদেরকে একদম ভাবলো না তোমরার ফাদার পোপা। (মজুমদার ১৯৮৮, ১৬)

--এখানে বলা বৈরী নয়, তার অনেকগুলি স্তরের কথা উঠে আসে।

বদর মধুর নৌকায় তার সাথে যায় পণ্য হিসেবে। দীর্ঘকাল কোনো ক্রেতা পাওয়া যায়নি বলেই সে এত দীর্ঘ সময় ধ'রে মধুর সঙ্গে যাত্রা করে। আখ্যানকার এই তথ্য দেওয়ার সূত্রে জানায়, "বদর খোজা ক্রীতদাস। মদুর পণ্য কদাচিৎ প'ড়ে থাকে, কিন্তু এই একটা যা সে কাউকে গছাতে পারেনি; চার বছর আগে মথুরায় কিনেছিল"। সেই বদর প্রসঙ্গে মধু ভাবে, "ঠোঁট উলটানো, ভুশকালো সেই খোজাদের থেকে বদরের অনেক তফাৎ। সফেদার মত গায়ের রঙ, টানা চোখ, হালকা ফূরফুরে ঠোঁট। কেবল নাকটা যা বদখত উঁচু আর তাতেই নাকি বোঝা যায় ওর রক্তে ইরানি ছোঁয়া আছে"। (মজুময়ার ১৯৮৮, ৬-৭) বদরের এই রূপ সম্পর্কে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে তার 'বেনে' পরিচিতিটি সামনে চ'লে আসে। এ তো আসলে নিজের পণ্যকে কী ক'রে বাজারে আরও লোভনীয় ক'রে

তোলা যায়, তারও ভাবনা। সেই ইঙ্গিতকে প্রতিষ্ঠা দিতেই রূপ বর্ণনার আগে নিজের পণ্য কাউকে না গছাতে পারার প্রসঙ্গটি থাকে।

এখন উনিশ শতক থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরি হচ্ছে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর ক'রে, তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি বিষয় হ'ল- ধর্ম, মাটি ও ঔচিত্যবোধ। ঘটনাচক্রে অমিয়ভূষণও তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে প্রাক্-উপনিবেশকালে প্রতিষ্ঠা করেও মধু ও বলার কথোপকথনে যে বিষয়গুলিকে মুখ্য স্থানে রাখেন, তা ধর্ম, মাটি ও ঔচিত্যবোধ। দেখা—এই ক্রিয়াটি পাপ, না পুণ্য, সেই সংশয়ে মধু বলাকে 'অপর' হিসেবে দেখে ঠিকই, কিন্তু মধুর দেশের সতীদাহ আর বলা'র দেশের ডাইনিকে পুড়িয়ে মারা—শেষ পর্যন্ত এক হয়ে যায় সেই ঔচিত্যবোধের বিচারেই। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে 'অপর'-এর সামনে নিজের ধর্ম প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাতিরেকে এ'হেন মনোভাব প্রকাশের কথা অভাবনীয়। অথচ, বলা যদি রাল্‌ফ্ ফিচ হয়, তবে তার বিদেশি পুঁজি সম্পর্কে, উপনিবেশ প্রসঙ্গে ধারণা আছে। নিশ্চয় সেই কারণেই সে নিজের দেশের কথা, যা তার শ্রেষ্ঠত্বের পথে বাধা দেবে, তা প্রকাশে কুণ্ঠিত।[9] মধুর ক্ষেত্রে 'আমি'-র বিস্তৃতি এতটাই বেশি যে তা শেষ পর্যন্ত 'অপর' যে বলা, তাকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেয়। বিদায়কালে বলা যখন আর ঘুরে তাকায় না, তাতে মধুর উল্লাস হয় না, সে ব্যথিত হয় বলাকে 'আমি'র অন্তর্গত করেছিল বলেই। তার মনে নিজের ধর্ম, নিজের ঔচিত্য প্রসঙ্গে যে সংশয়, তা

[9] 'ডাইনির কথার পিঠে-পিঠে সতীদাহ ধর্মের সাথে যুক্ত, মদু সা-র কাছে এ-রকম শুনে ফিরিঙ্গি গুম হয়ে রইলো। সে শুধু একবার বললো, তার এক কাজনকে ডান ব'লে পুড়িয়ে মারা হয়। কাজন মানে মামার ঘরের বোন, অবশ্য দূরসম্পর্কের, তা বেশ দুরসম্পর্কেরই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ইংরেজরা তখন থেকেই ঠোঁট-টেপা, দেশের কথা বাইরে বলে না। ফিরিঙ্গি বললো না, ভাবলো: জেসুইট মিশনারিদের বধের মাচায় তুলে চার টুকরো করা হয়, জীবিত থাকতেই নাড়িভুঁড়ি বার ক'রে দেখিয়ে দেয়া হয়, ইউনিট্যারিয়ানদের খোঁটায় বেঁধে জীয়ন্ত ঝলসানো হয়, পিউরিট্যানদের দেয়া হয় ফাঁসি। দর্শকরা রাণী বেজের জয়ধ্বনি করে। সে-সবই ধর্মের জন্য'। (মজুমদার ১৯৮৮, ২০)

তো বলার সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে স্থান দেওয়ার কারণে তৈরি হওয়া দুই 'আমি'-র মধ্যবর্তী সংশয়, যার কারণে সে একক কোনো 'আমি' হয়ে উচিত-অনুচিত প্রসঙ্গে কোনো একক নির্দিষ্ট উত্তরে পৌঁছাতে পারে না। তাই বলা যখন চেকাখাতায় ছেড়ে যায় মধুর নৌকা, তখন পাঠক বোঝে বলা চরিত্রটির প্রতি তার পিছুটান জন্মেছে, জাতীয়তাবাদী একটি পাঠে যা অসম্ভব। যদি বা জাতীয়তাবাদী কোনো আখ্যানে এমন পাঠ সম্ভবপরও হয়, তবে জাতীয়তাবাদের যে অপরায়ন প্রক্রিয়া, তা প্রকাশে সেই আখ্যান নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ। আবারও উল্লেখ্য, বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ'। হিন্দু মাহাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে জাতীয়তাবাদী বঙ্কিম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের কাছে পরাস্ত হন। যে জেবউন্নীসাকে খল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, সেই জেবউন্নীসাই কার্যত উপন্যাসের নায়ক হয়ে ওঠে চরিত্রের বিস্তৃতি এবং বিবর্তন অনুসারে। তবে 'মধু সাধুখাঁ' রচনার উদ্দেশ্য নিশ্চিতভাবেই 'রাজসিংহ' অপেক্ষা ভিন্ন। সেই কারণেই বলা নিজের মত প্রকাশের এত স্থান পায় এই আখ্যানে এবং মধুর সাথেও তার সম্পর্ক বৈরিতার হয় না।

আলোচ্য উপন্যাসে একটি অতীত কল্পনা করা হয়, যে অতীত লিখিত ইতিহাসের বাইরে থেকে যাওয়া বাস্তবকে ধরতে ও বুঝতে চায়। এখন, মানুষ অতীত কল্পনা করে তার জ্ঞানকে মাধ্যম হিসেবে রেখেই। এই জ্ঞান তার ব্যক্তিগত এবং কালেক্টিভ অভিজ্ঞতা, যা স্মৃতির আকারে ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চিত থাকে। যে অতীতে সে ফিরতে চায়, যে অতীত তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় নেই, সেই অতীতকে কল্পনা করতে গেলে কার্যত তার নিজের জীবৎকাল ও সেই অতীত সময়ের মধ্যবর্তীকালের ঘটনাসমূহের স্মৃতি নির্দিষ্ট কল্পনাপ্রকল্পকে প্রভাবিত করে। অতীতকে যদি একটি ধারণা হিসেবে ভাবা যায়, যা বর্তমানকালে রচিত হয় ওই নির্দিষ্ট সময়টি ছাড়াও বিভিন্ন কালের আরও বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে, যা আদতে ব্যক্তির চৈতন্যে উপস্থিত, তবে তা'ই এই উপন্যাসের

প্রতিপাদ্য। জাতীয়তাবাদী চেতনায় 'আত্ম' ও 'অপর'-এর সম্পর্ক নির্মাণের ক্ষেত্রে যে শূন্যস্থান থেকে যায়, সেই শূন্যস্থানকে তুলে ধরবার জন্যই এই অতীতকল্পনাপ্রকল্প অত্যন্ত জরুরি, যেখানে প্রকাশিত হয় বহুস্তরীয় 'আমি', বিপন্ন হয় একমাত্রিক 'আমি'-র ধারণা।

এবারে আসা যাক, অমিয়ভূষণের 'রাজনগর' উপন্যাসটিতে। মহাবিদ্রোহের পরবর্তী দুই দশক এই আখ্যানের সময়কাল। এই উপন্যাসের আখ্যানকে অনেক রকমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যেতে পারে। ফলত, এ উপন্যাস কী নিয়ে মুখ্যত কথা বলে, তার নানাবিধ উত্তর হ'তে পারে। আখ্যানের এই বহুমাত্রিকতা আদতে অমিয়ভূষণের নিজস্ব ধরণ। তবে এই আলোচনার সূত্রে এখানে আখ্যানের একটি নির্দিষ্ট দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা হ'ল সময়। উপন্যাসের অন্যতম মুখ্য চরিত্র রাজকুমার রাজচন্দ্র তথা রাজু শৈশব থেকেই আদর্শগত ভাবে বেড়ে উঠেছে তার মামা জাঁ পিয়েত্রোর ছত্রছায়ায়। আন্দাজে অনুভূত হয়, পিয়েত্রো তাকে মহাবিদ্রোহে যোগ দিতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যোগ না দিলেও তা রাজচন্দ্রকে পাল্টে দিয়েছিল। সমসময়ে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্যদিকে ক্রমপরিচিত হ'তে থাকা পুঁজিনির্ভর ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে, ফরাসীদের বিদ্রোহ, শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশ-- এইসবের দ্বন্দ্ব রাজুর মধ্যে প্রকট। সে দেখে, তাদের রাজত্ব, তাদের ক্ষমতা প্রতি মুহূর্তে খর্বিত হওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে নীলকর সাহেবদের দিক থেকে। ফলত, বাধ্যতই 'আমি কে?'--- এ'প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে সে নিজের সামনে বিরোধী অবস্থানে রাখে ইংরেজকে, 'অপর' হিসেবে। বিরোধী অবস্থান, কারণ নিজের যে অধিকার, যা কিছু সে নিজের ব'লে জানে, 'অপর' সেই অধিকার খর্ব করছে। ফলত এই 'অপর' 'আমি'-র বিস্তৃতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এই 'অপর'-কে তার সংস্কৃতি, তার সামাজিক ইতিহাসকে বুঝতে চাইবার সুবাদে সে তো প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বুঝতে চায়। দেওয়ান হরদয়াল এবং স্কুল মাষ্টার বাগচী, যে খ্রিষ্টান হয়েছিল---তারাও একই

সূত্রে আত্মানুসন্ধান করে। বাগচী খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সেও পূর্বের সেই একই কারণে উপন্যাসের শেষ অংশে কীবল্-এর বিরোধিতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে, মাটির সূত্রে সে যাদের সাথে সম্পর্কিত, রাজনগরের সেই রাজা এবং সাধারণ প্রজারা তা 'আমি'-র বোধকে পুষ্ট ক'রে তোলে। পক্ষ নেওয়ার ক্ষেত্রেও সে তাই জমির পক্ষ নেয়, ইংরেজকে বিরোধে রাখে।

ডানকান এবং কীবল্ যখন নিমন্ত্রিত হয় লাঞ্চ করবার জন্য, তখন দুই পক্ষের কথোপকথন (একপক্ষে ডানকান এবং কীবল, অপরপক্ষে বাগচী, বাগচীর স্ত্রী কেট্, হরদয়াল ও মনোহর। এই পক্ষ ক্ষমতা দখলের নিরিখে) কার্যত দুই ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন সমাজ-ইতিহাসের ভিন্নতায় দুই পক্ষের আশ্চর্য হওয়ার কথোপকথন।[10] সেই কথোপকথনে ইংরেজদের স্বজাতি-প্রীতির ভাব স্পষ্ট থাকে। উল্টোদিকে থাকে সাংস্কৃতিক অনুকরণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাশালীর পক্ষে থাকার বাসনা ও শিল্পবিপ্লবের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে মুগ্ধতা। জীবনের সার্থকতা যে ক্রমশ ইংরেজ হয়ে উঠবার মধ্যেই, এই বোধের পিছনে তো আসলে কাজ করে বিদেশী পুঁজি ও পুঁজির সূত্রে ক্ষমতার বিশালতাই।

---

[10] "ডানকান যে বোতলটাকে খুলিয়েছিল কীবল সেটাকে পছন্দ না করে ক্লারাট লেখা বোতলটাকে ইঙ্গিত করতে সেটা খুলে দিল এক খানাবরদার। কীবল নিজের হাতে গ্লাস ভরে নিলো।
বাগচী লাপে যোগ দিতে বললো-এরকম হলো কেন?
কীবলের বক্তব্যের অনুবাদ এই রকম—সবই কালো হ'তে চলেছে এখন, নদীর জল একসেপ্সন নয়। তাতে দুঃখও নেই। কারণ এ যুগটা কয়লা এবং লোহার-বোথ ব্ল্যাক। নয় কি? অন্য রঙ যদি কোথাও থাকে তবে তা হোয়াইটের নীলে।
সে হাসলো। ডানকান এই মৃদু রসিকতায় বললো-হ।
আলাপটা দ্বিতিয় কোর্সে লোহা-কয়লা কারখানার দিকে গড়িয়ে তা থেকে স্টীম এঞ্জিন এবং অবশেষে স্টিমারের গল্পে পৌঁছালো। স্টিমার যা নাকি বাষ্পের সাহায্যে সমুদ্রে চলে। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরং।...
ডানকান বললো-আটলান্টিক, প্যাসিফিক অথবা ভারতসাগরে স্টীমার আসিবে? ও নো, তুমি তেমন বলো না। কিংবা তা স্টীমারই থাকে কিন্তু হার ম্যাজেস্টির শিপ অফ দা লাইন হয় না। তুমি কি বলো ব্রিটেন ওন্ট সেইল দা সিস্"। (মজুমদার ২০০২, ১৮-১৯)

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মহাবিদ্রোহ দমনের পর শাসকের পদে বেশ জেঁকে বসেছে এবং দেশীয় রাজারা ক্রমাগত সংঘর্ষ ও আপোষের পথ ধরছে ইংরেজদের মোকাবিলা করতে গিয়ে।

কেন মোকাবিলা? আর মোকাবিলার অর্থই বা এখানে ঠিক কী? উপন্যাসেরই একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

> কিন্তু কীবল বললো—তাহলেও সংবাদটা এদিকে নতুন।...ছ-মাস পিছিয়ে হলেও আধুনিক ইংল্যান্ডের খবর আপনি রাখছেন যা আমরাও অনেকে জানি না। না, ক্যালকাটাতেও অনেকেই নয়।
>
> হরদয়াল মৃদু হেসে বললো- না জানলে মোকাবিলা হয় না। (মজুমদার ২০০২, ২৫)

এই কথার সূত্র ধরেই পরে বাগচী এবং কেটের মধ্যে কথোপকথন চলে-

> কিছুক্ষণ পরে কেট আবার বললো—'আচ্ছা, মোকাবেলা কথাটার মানে কী?
>
> -দেওয়ানজি যা বলেছিলেন, সামনা-সামনি হওয়া বলতে পারো। তবে তোমার-আমার মুখোমুখি হওয়া নয়। সাধারণত একটা বিপদ বা একটা আশঙ্কার আভাস পিছনে থাকা চাই। (মজুমদার ২০০২, ২৭)

ক্ষমতাশালী 'অপর' যেমন অনুকরণের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে 'আমি'-কেও ক্ষমতাশালী অবস্থান নিতে লুব্ধ করে, তেমনি 'অপর'-এর সেই পুঁজি, 'আমি'-র পুঁজিকে গ্রাস করে, অর্থনীতিকে নিজের দখলে আনতে চায়, যার কেন্দ্রে থাকে নিজের ক্ষমতা। নির্দিষ্ট 'অপর'-এর এই ক্ষমতাবান, বিত্তবান, আগ্রাসী স্বরূপ-প্রকাশ সেই নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকেরই ঘটনা। তার পূর্বে ঘটে গেছে শিল্পবিপ্লব, ফলশ্রুতিতে এসেছে বিশ্বব্যাপী বাজার দখলের লড়াই। ফলত দেশীয় বণিকদের বাজার বিপন্ন ও দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক বাজার বিপন্ন। এই বাজার আবার অনেকাংশেই বিনিময়নির্ভর। কিন্তু পুঁজিবাদের চরিত্র মেনেই বিদেশী পুঁজি ও বণিকের মূল আগ্রহ মুনাফায়। ইংরেজরা বণিক হয়ে

এসেছে বাজার দখল করবে ব'লে। এই বাজার দখল শুধু ক্রেতার খোঁজেই নয়, উৎপাদন সামগ্রী ও শ্রমিকের খোঁজেও। কেন্দ্রে মুনাফা, যার অংশীদারিত্ব কেবল পুঁজিপতি অর্থাৎ মালিকেরই। অতএব, মুনাফার ভিত্তিতে ক্রেতা ও শ্রমিক একদিকে, অন্যদিকে পুঁজিপতি। সাথে এলো শিল্প বিপ্লবের আধুনিকতাও। সেই আধুনিকতা শেষ পর্যন্ত এলো, কিন্তু সামন্তপ্রভুর প্রাথমিক ভিত্তি যে জমি, তাতে হাত পড়লে বিরোধও বাধল। এইভাবেই 'অপর' ক্রমশ চ'লে এলো 'মোকাবিলা'-র জায়গায়। অথচ, 'মধু সাধুখাঁ'-তেও 'অপর' ছিল, ইংরেজই ছিল রাল্‌ফ্ ফিচ্---এই ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিরই প্রধান পরামর্শদাতা, কিন্তু দুই পক্ষেরই 'আমি' ও 'অপর'-এর কথোপকথনে ছিল জানার কৌতূহল। কারণ রাল্‌ফ্ ফিচ্ 'বলা' তখনও তার পুঁজিকে আগ্রাসী আকারে হাজির করেনি। কেউ কারও ব্যবসা দখল করতে চায় না, একচেটিয়া মুনাফার ধারণা নেই। ক্ষমতার কাঠামো তৈরি হয়নি বলেই, প্রতিপক্ষ তৈরি হয়নি বলেই এবং ক্রেতা-বিক্রেতা-উৎপাদক সবাই নিজেদের স্থান বিনিময় করতে পারে বলেই, সকলকেই বাজারব্যবস্থায় দরকারি বলেই, এই সম্পর্ক সম্ভবপর। তাই নিজেদের ধর্ম, দর্শন নিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলা ও মধুর মধ্যে মতান্তর ঘটলেও কেউই প্রশ্নহীন মহত্ত্বের দাবি রাখে না। সন্দিহান হয়, দ্বন্দ্বে থাকে, 'অপর'-কে 'শত্রু' হিসেবে দাগিয়ে দেবার তার কোনো দায় থাকে না। কিন্তু 'রাজনগর' উপন্যাসে সেই লাঞ্চে কীবল এবং ডানকান যেভাবে তাদের সাপেক্ষে 'অপর'-এর ধর্মকে দেখে, তাতে থাকে ক্ষমতায় উচ্চ অবস্থানে থাকা 'আমি'-র বোধ।

কিন্তু এই কথাটুকুই যদি বলতে হয়, তাহ'লে তো জাতীয়তাবাদের পথ ধ'রেই হাঁটতে হয়। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য তা নয়। ডানকান ও কীবলের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আখ্যানের যে উদ্দেশ্য আর গোপন থাকে না, তা সরাসরি উনিশ শতকে নির্মিত জাতীয়তাবাদের ভ্রান্তিগুলিকে নির্দেশ করে। ডানকান সেই লাঞ্চেই কথা প্রসঙ্গে কীবলকে

বলে- "...কিন্তু মনোয়ার রাজপুট আছে। রিঅ্যাল রাজপুট। দে হেল্পড আস দা রাজপুটস। ইউ নো।" এ তো কার্যত উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদ নির্মিত বাইনারিগুলির ভ্রান্তিকেই ইঙ্গিত করা।

রাণীমার শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে কীবল বলে,

> মিস্টার হৃদলাল, ধর্ম নিয়ে কথা বললে আশা করছি এ টেবলে কেউ দুঃখ পায় না। আজ যা দেখিলাম তা হয় অর্থোডক্স পেগানিজম, পাথরপুজা, না? আর আমাদের হোয়াইট হয়তো রিফর্মড পেগানিজমের উপাসক হয়।
>
> ডানকান পোর্ট ঢেলে নিয়েছে এক গ্লাসে, অন্যটিতে শ্যাম্পেন। যেন তা মাপ করে মিশালে নতুন কিছু হয়।সে হোয়া হোয়া করে হাসলো। বললো—সইত্য। এ, মানোয়ার, তোমার আইডল ছিলো। দ্যাট ব্ল্যাক নেকেড গ্যাল্, ওয়েলফর্মড দো। শি ওঅজ অ্যান আইফুল, আই বেট। মনোহর তাদেরই একজন যারা নিজের জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন। সে বললো—এটাও একরকমের আইডল, সার, তবে একে বরং ফ্যালাস অর্শিপ বলতে হবে।
>
> কীবল যেন শিউরে উঠলো। বললো—আক্ গশ।
>
> বাগচীর মুখে কী একটা হাড়ের কুচি পড়েছিলো? কিছু সময় যেন সেজন্যই বিব্রত রইলো। কিন্তু হঠাৎ সে বললো—বাট মাচ অব ইট ইজ সিম্বলিজম। অ্যান্ড ইন এভরি রিলিজিআন দেয়ার আর সিম্বলস দ্যাট ক্যান বি মিসইন্টারপ্রিটেড। (ইহার অনেকাংশই প্রতীক ব্যবহার। সব ধর্মেই প্রতীক ব্যবহার করা হয় যার কদর্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব)। (মজুমদার ২০০২, ২২)

এরপরই দেখা যাক মধু ও বলার মধ্যে ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে কথোপকথন।

> একটু ভাবলো ফিরিঙ্গি, বললো—তোমার সঙ্গে সাত-আট মাস হলো, মদো।
>
> --তা হলো। তোমার কাছে জানলাম, শুনলাম অনেক। তোমার ধর্মের কথা, তোমার এক রাণীর দেশের কথা।
>
> --আমার জেসাস্-এ তোমার আপত্তি নাই, মদো?

--কিছু না। আমারদের এত অবতার। তোমরার এক মানতে কী আপত্তি হৈবো? তবে আমারদের অবতার ভগবান যুদ্ধে জিতে—রাম বলো, কৃষ্ণ বলো। তোমারদের অবতার সি নিজে মরে, মরাও যে ভালো হয় তা দেখালে।

-- তুমি বড়ো ভালো, মদো।

--তাই ব'লে গোটা পৃথিমীকে দুই রাজার রাজ্যেতে ভাগ করা—তা মানি না। মদু হাসলো। (মজুমদার ১৯৮৮, ৪৫)

আবার আরেক স্থানে মধু ভাবে, বলার ধর্মে দেখা পাপ। আদম লাল ফল দেখেছিল বলেই এত যন্ত্রণা, সেই দ্যাখাই আদিম পাপ। কিন্তু আবার মধু সূর্যকে প্রণাম করে, আবার যেন পরের দিন সূর্যকে দেখতে পায়, এই প্রার্থনা করে। কী উচিত-কী অনুচিত, কী পাপ-কী পুণ্য; এই প্রসঙ্গে সে সন্দিগ্ধ হয়।

'অপর'-এর ধর্মকে, দর্শনকে কীবল এবং ডানকান যে দৃষ্টিতে দেখে, মনোহর, হরদয়াল যে দৃষ্টিতে দেখে আর মধু বলা যে দৃষ্টিতে দেখে, তা পৃথক। কীভাবে পৃথক, তা এই উদ্ধৃতিগুলিতে স্পষ্ট। আলাদা ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখানে নেই। কিন্তু কেন তারা আলাদা? বাজারব্যবস্থা পৃথক বলেই, পুঁজির চরিত্র পৃথক বলেই।

শেষ পর্যন্ত রাজনগরে বিদেশী শক্তি পুরোপুরিভাবে বাজার দখল করতে পারে না, কিন্তু স্কুল তৈরি হয় সেখানে, ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা ঢুকে পড়ে। অতএব, সূত্র অনুসারে, যে জাতীয়তাবাদ মুখোমুখি দাঁড় করায় দুই পক্ষকে, যে জাতীয়তাবাদের ধারণা আখ্যানের সময়কালের সমসাময়িক, তার ক্রমান্বয়িক বিকাশ এই রাজনগর-অঞ্চলে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য স্থানের মত হওয়ার কথা নয়। সেই একই অর্থে আধুনিক 'শহর'-ও এখানে বিকশিত হওয়ার কথা নয়, বাজারব্যবস্থা পুঁজিবাদের হাত ধ'রে বিকশিত কিংবা বিবর্তিত হচ্ছে না ব'লে। অর্থাৎ নতুন চরিত্রের পুঁজির হাত ধ'রে নতুন সামাজিক মূল্যবোধও আসবার কথা নয় এখানে। সেই কারণেই কি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা

লাভের পরও মহিষকুড়াকে "আকাশ থেকে দেখলে মনে হয়, বিস্তীর্ণ সবুজ-সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। ...মনে হতে থাকে এরা বোধহয় বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে"?

মহিষকুড়ার উপকথায় যে ক্ষমতা-সম্পর্কটি আখ্যানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাতে আসফাক, জাফরুল্লা মিঞার অধীনস্থ আধিয়ার। অর্থাৎ, জাফরুল্লার জমিতে আসফাক শ্রম দ্যায়, কিন্তু জমির উপর তার নিজস্ব কোনো স্বত্ত্ব নেই। 'গণতান্ত্রিক, সার্বভৌম ভারতের সর্বহারা এই আসফাক তার প্রণয়ী কমরুনকে হারায়, হারায় তার ঔরসজাত সন্তানকেও। এই সবেরই মালিকানা জাফরুল্লার। কিন্তু প্রতিবাদ করবার ভাষা জানে না সে, প্রতিবাদ করা উচিত ছিল কি না, তা নিয়েও সে সন্দিহান। 'আমি' কে? এই 'আমি'-র ঔচিত্যবোধে তার কী করা উচিত ---এই দ্বন্দ্ব মধুরও ছিল। কিন্তু মধুর ঔচিত্যবিচার তার মৌলিক অধিকারের নিরিখে নয়, যা আসফাকের ক্ষেত্রে ভিন্ন। এমতাবস্থায় জাফরুল্লার অচিহ্নিত পীড়ন (অচিহ্নিত; কারণ আসফাক তা চিনে উঠতে পারে না নিশ্চিত ক'রে, কেবল ঘটনার অন্তর্ঘাতে নিজে পাল্টে যায়), আগ্রাসন এবং অন্যদিকে শহরের সাহেব, যারা সেই সাদা সাহেবদেরই স্থান নিয়েছে, তাদের ন্যায়প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার দেবার আশ্বাস, তার বিশ্বাসভঙ্গতা---এইসবে আসফাকের মধ্যে যেন এক মদ্দা মোষ ডেকে ওঠে, সে বনে হারিয়ে যাওয়ার ঘোরে সমান্তরাল এক যাপনে ক্রমশ ঢুকে যেতে থাকে। অথচ তার সেই বনও ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে, পিচের কালো সড়ক মাটির উপর চেপে বসে, শহর থেকে নিয়ে আসা এক লরিকে সে ক্ষেপে ওঠা বুনো মর্দা ভেবে ভুল করে।

> ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল আসফাকের। ধড়মড় করে সে উঠে বসল। তার আদৌ ভালো ঘুম হয়নি। একবার তার মনে হয়েছিল, হাঁক মারতে মারতে একটা কালো মোষ এসে দাঁড়িয়েছে

দ্বারিঘরের সামনে। দ্বারিঘরের চাল ছেয়ে এত উঁচু, আর আগুনের মালসার মত চোখ। আর তখন সে যেন নতুন এঁড়ে মোষের মতো ভয়ে ভয়ে এই ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছিল। সেটা কি স্বপ্ন? না চোখেও দেখেছিল সে?

সজাগ হল আসফাক। এখন দিনের আলোই চারিদিকে। এটা সেই বলদের ঘরই। ঘুম ভাঙতে খুব দেরি হয়েছে তার। এমন আলো ফোটার আগেই বলদ ছেড়ে দেওয়ার কথা।

তা, কমরুন, ভাবল আসফাক, আসল কথা বাথানে গাবতান মোষ থাকতে পারে কিন্তু বন কোথায় আর? চাউটিয়া যা বলে, বড়বিবি যা বলে, তা মানাই ভালো। এখন এক ছটাক জমি নাই যা কারো না কারো, এক হাত বন নাই যা কারো না কারো। বনে যে হারিয়ে যাবে তার উপায় কী? এখন বোঝা যাচ্ছে, গাবতান মোষ আর গাবতান কুমরকে নিয়ে বনে গিয়েও কিছু হত না।...

মুন্নাফ বলল, 'উঠছ আসফাক?'

'উঠলাম। কখন আইসলেন তোমরা?' আসফাক বিবর্ণ মুখে হাসল।

'ভোর-রাইতৎ।'

'কেন, শহর থাকি রাইতৎ রওনা দিছিলেন? অন্ধকারের পথ তো!'

'লরিৎ আসলাম। তা দেখো নাই? আব্বাজান লরি কিনছে একখান। তারই বাদে শহরৎ গেইছং।'

'অ।'

'এখন থাকি গরুগাড়ি তামাক পাট যাইবে না বন্দরৎ। লরিৎ যাইবে। কী ভকং ভকং হরন, আর কত্ত বড় বড় চাকা। ডারাইবারও আসছে।'...

দ্বারিঘরের কাছে এসে সে চমকে দাঁড়াল। বাপ্পু! বলল সে মনে মনে। আর অবাক হয়ে থেমে গেল। চাকর, আধিয়ার, গ্রামের মানুষদের ভিড়ের মধ্যে সে এক প্রকান্ড গাড়ি। মানুষের কাঁধ সমান উঁচু উঁচু চাকা। কুচকুচে কালো রং।

চিবুকে হাত দিয়ে সে ভাবল এটাকেই কি তাহলে সে বুনো মর্দা ভেবেছিল রাত্রিতে! নাকি স্বপ্নই ছিল সেটা?

আসফাক অবশ্যই জানত না, ঘুমের ঘোরে দেখা বস্তু স্বপ্নে অন্য রূপ নিতে পারে যদি চিন্তার যোগ থাকে।

> সে বলদের পিছনে যেতে যেতে মন্তব্য করল, 'বাব্বা ইয়ার সাথৎ কাঁউ পারে?'
>
> সে বলতে চায়, এই কলের মোষের সঙ্গে কোনো মোষেরই লড়াই জেতার ক্ষমতা হবে না। সে যত দেখল, তত অবাক হয়ে গেল। (মজুমদার ১৯৮১, ৮৬-৮৯)

তার এই ভ্রম তো কেবল তার একার ভ্রম নয়। বাজার, সমাজ ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়নি ব'লেই এই শকটে তাদের ভ্রমের প্রকাশ ঘটে। আখ্যানকারের বক্তব্য-

> কিন্তু মুশকিল এই, সংগ্রাম ও শান্তির প্রতীক হিসাবে তরবারি ও লাঙল ইউরোপের মানুষেরা এত বেশি প্রচার করেছে যে এখন আমাদের পক্ষে লাঙলের সঙ্গে লোভ শব্দটাকে যুক্ত করতে সঙ্কোচ দেখা দিয়েছে। লাঙল যে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির চিহ্ন হতে পারে, তা ভাবতেও অনিচ্ছা হয়। (মজুমদার ১৯৮১, ২৩)

সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশের মূলে কৃষি থাকবে, না শিল্প—এই দ্বন্দ্বের সাপেক্ষে একটি মতামত হিসেবেই একে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। দুইয়ের মূলেই লোভ, অতএব, এর কোনোটাই কাঙ্ক্ষিত নয়--- মতামতের উদ্দেশ্য সম্ভবত তা নয়। অন্তত উপন্যাসের চলন তাই বলে না। বরং মূলে থাকা লোভই আক্রমণের প্রসঙ্গ। সেই লোভেই দুই বাজার-ব্যবস্থা এইরকম একটি-নির্দিষ্ট-সামাজিক-ইতিহাস-থাকা অংশের ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা মানুষকে শোষণ করে—এই অভিমত হওয়াই উপন্যাসের চলনের সাপেক্ষে সঙ্গত। শেষ পর্যন্ত তাই জাফরুল্লা, শহরের সাহেব, 'শহর' নামক ভিন্ন এক দুনিয়ার প্রমাণ সেই ট্রাক---এদের কেউই মুখ্য হয়ে ওঠে না, কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা নিয়ে তাই ক্রমশ আসফাক আখ্যানের নায়ক হয়ে ওঠে। দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত 'মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প' বইটির পেছনের মলাটে উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের নিজের অভিমতটি এখানে উল্লেখ্য।

> গল্পটা এক অকিঞ্চনের একমাত্র রত্ন সেই রমণী ও তার গর্ভজাত আত্মজকে হারিয়ে ফেলা। যে শব্দ জানে না, প্রেম শব্দটাকেই শোনেনি, সুতরাং ভাষা-উলঙ্গ এক নিছক মানুষের most fundamental দাঁড়ানোর জায়গা (Adam এর যদি Eve হারিয়ে যেত?) হারিয়ে ফেলা। তার

> তুলনায় জমি, জিরাত, জমির রাজনীতি এ সবই অকিঞ্চিৎকর নয়? প্রবঞ্চনার গভীরতম খাদে পড়েছে আসফাক। তার নালিশ 'বেতন না পাওয়ার' ভাষা নেয়, সেজন্য সে নিজেকে সাবাসও দেয় কিন্তু মোষ হয়ে যায়। আদিমপুরুষের সেই যন্ত্রণায় আঁড় আঁড় করে ডেকে ওঠে, সে কি জমিজিরাত-বেতনের যন্ত্রণায়, নাকি ঘাস ফুলে কার পিতলের নাকফুল দেখে?

'মধু সাধুখাঁ'—তে যে 'আমি'-র বোধ নির্মিত হয়, তা মুখ্যত মধুর ভাবনার সূত্রেই, মধুর আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই। 'রাজনগর'-এ স্যার রাজচন্দ্র, কিংবা হরদয়াল, বাগচী বা মনোহর সিং—এদের চরিত্র সেই পূর্বতন 'আমি'-রই বিবর্তিত রূপ। কেন এরাই 'আমি'-র দিকে? যে অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে আখ্যানগুলি বিস্তৃত, এরা সেখানকার সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা, সেখানকারই শারীরিক-নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষ, অন্যদিকে যে 'অপর', সে বাইরে থেকে আসা, ভিন্ন শারীরিক-বৈশিষ্ট্যযুক্ত মানুষ (অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যই যাকে অনেকাংশে 'অপর' ক'রে দ্যায়) কখনো শত্রু, কখনো শত্রু নয়।

তিনটি আখ্যানেই লক্ষ্যনীয়, 'আমি' সম্পর্কে যাবতীয় অনুসন্ধানে প্যারামিটার বা স্থানাঙ্ক হিসেবে থাকছে ইউরোপ এবং ইউরোপ নিয়ে আখ্যান যতটা বিস্তৃত, 'মধু সাধুখাঁ' এবং 'রাজনগর' উপন্যাসে প্রায় সমবিস্তৃত অ-ইউরোপীয় চরিত্রগুলির জীবন। উপনিবেশের সূত্রে ইউরোপ নিজেকে কেন্দ্রে রেখে যেভাবে 'অপর'-কে দেখতে শুরু করল, তাতে সে ক্ষমতায় শীর্ষে। যেহেতু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সচেতন ইতিহাসলিখন শুরু হ'ল তাদের হাত ধরেই, তাদেরকেই স্থান দেওয়া হ'ল ইতিহাসে। সেই ক্ষমতা-কাঠামোটিকে চ্যালেঞ্জ করে উপন্যাসগুলি, কার্যত প্রশ্ন তোলে ক্ষমতার যাথার্থ্য নিয়েই। আসফাকের সামনে 'অপর' হিসেবে তাই থাকে শহরের বাবু, জাফরুল্লা, যারা ক্ষমতাকাঠামোর নিরিখেই 'অপর' এবং বিপ্রতীপে থাকা 'অপর'। অন্যদিকে তার 'আমি'-র বোধ গ'ড়ে তোলার

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায় জঙ্গল, জমি, কমরুন, মদ্দা বুনা মোষ। কেন? এরা সক্কলে এই বাজারব্যবস্থাতে শোষিত ব'লে।

'মহিষকুড়ার উপকথা'-তে সেই 'আমি'-র আরও বিবর্তিত স্বরূপ তার দ্বন্দ্ব নিয়ে প্রকাশিত হয় আসফাকের মধ্য দিয়ে, যে আবার পিছনে ফিরতে চাইছে, যন্ত্রনির্ভর সভ্যতায় যার আত্মপ্রকাশের ভাষা জানা নেই। কেন এই তিন উপন্যাসের এই 'আমি'-দের একই 'আমি'-র বিকাশ বা বিবর্তন হিসেবে দেখব? তা কি আদৌ সঙ্গত? এই তিন উপন্যাসই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলকে নিয়ে কথা বলে, এবং তাদের ক্রিয়া নির্ধারিত হয় নির্দিষ্টভাবে সেই অঞ্চলেরই মানুষ হিসেবে, নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষ হিসেবে তাদের কী করা উচিত, এই ঔচিত্যবোধের মাধ্যমে এবং চরিত্রগুলির যাবতীয় দ্বন্দ্বের মূলে, তাই চরিত্রগুলি এখনকার পাঠকের সঙ্গে কথোপকথনে গেলেই তাদের নির্দিষ্ট সময়ের পরিচিতি নিয়েই প্রতি মুহূর্তে ক্রিয়া করে। উপন্যাসগুলির এই চরিত্রগুলি, যাদের মধ্য দিয়ে 'আমি'-র এই স্বরূপ খোঁজা হচ্ছে, তারা বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন ধর্মের। তাই তিনটি উপন্যাস পাঠের পর যে 'আমি'-র বোধের সাথে পাঠক পরিচিত হয়, সেই 'আমি' কোনো একক, অখন্ড 'আমি' নয়--- বহুস্তরীয় 'আমি'। উপন্যাসের এই বোধকে আরও ব্যাপ্ত করতে তাকে অতীত হিসেবে দেখতে চাওয়া থাকে, যে অতীতের কথা ক্ষমতাবানের ইতিহাস লিখে যায়নি। এই 'আমি'-র সবটা তাই পরিচিত নয়। বর্তমানের প্রমাণচিহ্নগুলি ধ'রে যে অতীতকল্পনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য, এরকমই এক অতীত এখানে কল্পিত হয়, যাকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, আবার রৈখিক তথ্যনির্ভর ইতিহাস যাকে স্বীকারও করে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিখিত রৈখিক ইতিহাস, মৌখিক আখ্যান ও অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাস

কোচবিহারকে কেন্দ্র ক'রে সচেতন ইতিহাসলিখন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতকের শেষভাগে, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা তার আদিতম নিদর্শন। তার পূর্বের যা ইতিহাস, সবই পুরাণ-নির্ভর। ভূমিকা অংশে উল্লিখিত হয়েছে, ভগবতীচরণের এই রচনাটিতে সামান্য কিছু কথা পাওয়া যায় এখানকার সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে, তাঁদের জীবিকা, পোশাক, যাপন নিয়ে। কিন্তু তাছাড়া অন্য সব ক'টি বইতেই ইতিহাস বলতে মোটামুটিভাবে-রাজবংশ যতদিন আছে ক্ষমতায়, সেই সময়কালকেই রাখা হয়েছে এবং মুখ্য আলোচ্য রাজপরিবারই। সেই ইতিহাস থেকে বৃহত্তর সমাজ, মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিশদ কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। রাজার এই ইতিহাসে পূর্বকালের পৌরাণিক ইতিহাস যেমন পাওয়া যাচ্ছে, তেমনি পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তীকালের ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চাও, যা ঘটছে রাজদরবারে-বাইরে-থেকে-কাজ-করতে-আসা ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাত ধ'রে। দুইক্ষেত্রেই রাজবাড়ির বাইরের অংশ উপেক্ষিত। এমন কি দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' শীর্ষক বইটিতে 'কোচবিহার রাজ্য' নামক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তাকে নেহাতই-রাজাদের-বিস্তৃত-বংশ-তালিকা বললে অত্যুক্তি হবে না। ভগবতীচরণের বইটি 'কোচবিহারের ইতিহাস' এই নাম নিয়ে প্রকাশিত হয় প্রথমবারের জন্য ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে। তার বিজ্ঞাপনে তিনি কোচবিহারের পৌরাণিক ইতিহাস প্রসঙ্গে জানাচ্ছেন, 'তৎপাঠে দেশের প্রকৃত অবস্থা কিছুই অবগত হওয়া যায় না'। কিন্তু এই বইটিতেও জনসাধারণের কথা যা পাওয়া যায়, তা আদমসুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলি বাদে আর তেমন কিছুই নয়। ফলত ইতিহাস হিসেবে দাবি করা এই রচনাগুলি শুরু হয়েছে কোচবংশীয় বিশ্বসিংহের ১৫১০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা হওয়ার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ভূপ বাহাদুর মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের আমলে কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তির সময়কালের মধ্য দিয়ে। মধ্যবর্তী এই সময়কালকে কীভাবে দেখা হয়েছে এই বইগুলিতে? 'ইতিকথায় কোচবিহার' (২০০০ খ্রিঃ)

শীর্ষক বইটি, যার লেখক ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, তার সূচিপত্রে তার বিষয়ক্রম এখানে উল্লেখ্য। এই বইটি অনেকখানিই অনুপ্রাণিত ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত খাঁ আমানত উল্লা আহমেদের 'কোচবিহারের ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থটি দ্বারা, ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র ঘোষালকৃত এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১। নাম পরিক্রমা ২।কোচবিহার রাজ্যের রাজধানী ৩। কোচবিহারের নদীর কথা ৪। কৃষিতে কোচবিহার

৫। কোচবিহারে পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ৬। কোচবিহার জেলায় সমবায় আন্দোলন ৭। কোচবিহার পার্ক

৮। কোচবিহার রাজ্যে সতীদাহ ব্যবস্থা ৯। কোচবিহারের রাজকাহিনী ১০। কোচবিহারের রাজবাড়ির অন্দরমহল

১১। কোচবিহার রাজদরবারে সাহিত্য-চর্চা ১২। কোচবিহারের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি ১৩। কোচবিহারের দেবদেউল ১৪। সহায়ক গ্রন্থসমূহ

এখানে ৯, ১০ ও ১১ ক্রমের অধ্যায়গুলি বাদ দিলে অন্তত নামগুলি দেখে মনে হবে, এরা রাজবাড়ি-কেন্দ্রিক আখ্যানের বাইরের কথা বলবে। কিন্তু তা নয়। ক্রমাঙ্ক ৬ এর অধ্যায়টিতে কেবলমাত্র ছক ভেঙে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কিভাবে সমবায় আন্দোলন গ'ড়ে উঠছে, সে সম্পর্কে স্বল্প কিছু কথা আছে। কিন্তু এর কোনোটিতেই সাধারণ মানুষ, যারা ভারতভুক্তির পর ভারতীয় নাগরিক হিসেবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছে, তারা মুখ্য নয়। বিভিন্ন ঘটনা, যা ইতিহাসে আলোচিত (কারণ তার কেন্দ্রে রাজা), তা জনমানসে কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করছে, তার কোনো সন্ধান এখানে নেই এবং এই রকম কোনো দাবিও তারা করে না বা দাবি করা যে প্রয়োজন সেই কথাও বলে না। এই বইটি একেবারেই ব্যাতিক্রম নয়। রাজবাড়ির দলিলপত্রের যে পরিসংখ্যানগুলি এই বইয়ে দেওয়া তা-

ও নিতান্তই অপর্যাপ্ত, তা থেকে পরিষ্কার কোনো চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, জনমানস কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে, কীভাবে বাইরের ঘটনাগুলি তাদেরকে নির্দিষ্ট রূপ দিচ্ছে, সে সম্পর্কে এই লিখিত ইতিহাসগুলি কোনো খোঁজ দিতে পারছে না। তবে কি মানুষ নিজের অতীত সম্পর্কে এক অভাববোধ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়? না, বরং এই অভাবকে পূরণ করতে সে সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে কিছু কৌশল অবলম্বন করে। সে তার শোনা কথাগুলি নিয়ে এক অতীত কল্পনা করে। কিংবা অন্যকোনো স্থান, সাংস্কৃতিকভাবে যে অঞ্চলের সাথে তার নিজের মাটির মিল, সেই অঞ্চলের ইতিহাসকে সে পুঁজি করে। ফলত অভাববোধ আর থাকে না ঠিকই, কিন্তু বিকাশের যে ক্রমটি আদতে ছিল, তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অতএব, বাস্তব থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। কিন্তু 'বাস্তব' কী? যা আদতে ছিল? অর্থাৎ স্মৃতির মেদবিহীন এক ঘটনা, যা সেই নির্দিষ্ট সময়েরই মতো? যদি সেই নির্দিষ্ট সময়েরই মতো হবে, তবে বর্তমানে তার প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? বরং ইতিহাসের কাজ, সেই সময়ের সেই ঘটনা কী ক'রে তারপরের বিভিন্ন ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করল, কী ক'রে ঘটনার স্মৃতিও সময়ের সাথে সাথে পাল্টালো, তা আলোচনা করা। কারণ অতীতবোধের প্রাসঙ্গিকতার মূলেও আছে এই প্রয়োজনবোধ। প্রসঙ্গত, 'Memory: Histories, Theories, Debates' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের প্রাক্‌কথনে Susannah Radstone এবং Bill Schwarz-এর মন্তব্য উল্লেখ্য। তাঁদের বক্তব্য- উত্তরাধুনিক যে সময়ে আমরা বেঁচে আছি, সেই সময়টা সামাজিক স্মৃতিবিলোপের সময়। আধুনিক বিষয় হিসেবে আমরা সেই অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন, যা আমাদের সৃষ্টি করেছে। ফলত, স্মৃতির পাশাপাশি বিস্মৃতি, স্মৃতিলোপ, স্মৃতিহীনতার ধারণাও জুড়ে গেছে। 'খাঁটি' স্মৃতি আর কোথাওই নেই। একই প্রসঙ্গে, ওই একই বইয়ের একটি প্রবন্ধ, 'Telling Stories: Memory and Narrative'-এ Mark Freeman-এর বক্তব্য, কোনো ঘটনা ঘটে যাবার পর মানুষ যখন সেই ঘটনার স্মৃতি

সংগ্রহ করে, তখন সেই ঘটনা সেই নির্দিষ্ট সময়ে যেভাবে ঘটেছিল, কখনোই ঠিক সেভাবে আর গৃহীত হয় না। তার সাথে যুক্ত হয়, যে ভাবছে, তার সময় এবং ঘটনাটি যখন ঘটমান, সেই সময়ের মধ্যবর্তী আরও বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি। এভাবেই এক ঘটনার স্মৃতি সময় বেয়ে এগিয়ে চলে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। এই অন্যান্য স্মৃতি এতে জমা হয় বলেই, এই আলোচনায় তা গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাস স্বতন্ত্র প্রস্থান হিসেবে তথ্যনির্ভর, তথ্যই একমাত্র বাস্তবতা রক্ষা করে ব'লে এই প্রস্থানের দাবি। ফলত সাহিত্যিক আখ্যান সেই বিচারে কখনোই ইতিহাসের স্থান নিতে পারে না। কিন্তু, যেখানে ইতিহাস লিখিত আকারে মানুষের সামনে নেই, সেখানে সেই ইতিহাস (বা এক্ষেত্রে আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে 'অতীতবোধ' শব্দবন্ধই অনেক নিরাপদ) কীভাবে এই আখ্যানগুলিতে আসছে? অতীতকল্পনাপ্রকল্পে কী কী উপাদান আসছে? তা থেকে কোন রাজনীতির সন্ধান পাওয়া যায়?

'মধু সাধুখাঁ', 'রাজনগর' ও 'মহিষকুড়া' তিনটি উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রেই লিখিত। কোচবিহার অঞ্চল--- যখন সে বৃহৎ কামতার অংশ, যখন ইংরেজদের সাথে চুক্তিবদ্ধ দেশীয় রাজ্য ও যখন ভারতভুক্ত এক জেলা---এই তিন সময় যথাক্রমে উপন্যাস তিনটিতে আছে। আবার কোচবিহারের লিখিত ইতিহাস এই তিনটি ম্যাপেরই তথ্য দেয় ঐতিহাসিক ক্রমটি বোঝাতে।

এই তিনটি উপন্যাস যে ভৌগোলিক অঞ্চলের যে সময়কার মানুষের যে কথা বলে, তাদের সেই কথা লিখিত ইতিহাস কখনোই বলে না। তার মানে তো লিখিত ইতিহাস সেই থেকে যাওয়াগুলিকে, অতীতের সেই কল্পিত সম্পর্কগুলিকে অস্বীকারই করে পরোক্ষভাবে! কিন্তু উপন্যাসগুলির আখ্যান যাতে আজগুবি না হয়ে যায়, তার জন্য

আখ্যানগুলি সবসময় ডায়লগ তৈরি করতে থাকে লিখিত ইতিহাসের সাথে। ফলত তার 'সিরিয়াসনেস'-ও বজায় থাকে। 'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাস ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের সময়কাল নিয়ে কথা বলে। রৈখিক ইতিহাস অনুযায়ী, মহারাজ নরনারায়ণ কোচবিহারে শাসন ক্ষমতায় ছিলেন ১৫৫৪ থেকে ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন তাঁর ভাই শুক্লধ্বজ বা চিলারায় এবং নরনারায়ণের পর তাঁর পুত্র মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহাসনে বসেন। সতীদাহের কথাও রাজবাড়ি ও ইংরেজদের পরস্পরকে প্রেরিত কিছু চিঠিতে পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে যা ইংরেজদের মাধ্যমেই রদ হয়েছিল। এইরকম কিছু তথ্য, যা রৈখিক ইতিহাস থেকেই নেওয়া, তাকে চিহ্নক হিসেবে রেখে অমিয়ভূষণ মধু ও বলাকে এক নৌকায় ভাসান, সেই নদীপথও ভৌগোলিকভাবে সত্য (এই ভূগোলের ইতিহাসও তো আসলে লিখিত ইতিহাসই), বলাকে আখ্যানকার বলে রাল্‌ফ্ ফিচ্, যে ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসেছিল এবং পরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রধান পরামর্শদাতা হয়েছিল।

'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র সেন 'কোচবিহার' শীর্ষক রচনায় মহারাজা নরনারায়ণ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রে বলেন,

> গণকেরা রিষ্টি করিয়া বলিয়াছিল, যদি এক বৎসর রাজা সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন, তবে রিষ্টি কাটিতে পারে, তদনুসারে মহারাজ নরনারায়ণ একবৎসর সন্ন্যাস লইয়া গৃহাশ্রম ছাড়িয়াছিলেন। এই সময়ের জন্য শুক্লধ্বজ (চিলা রায়) রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে পর্যটক রাল্‌ফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) কোচবিহারে আসিয়াছিলেন, তাহার ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যায়, তখনও কোচবিহারে জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেশি ছিল, রাজধানীতে বড় বড় পশু-চিকিৎসালয় ছিল এবং প্রজারা পিঁপড়াকে চিনি খাওয়াইত। (বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৬, ১২০)

'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে রাল্‌ফ্ ফিচ্ 'বলা' হয়ে যায়। এই নামকরণ সরাসরিভাবে লিখিত ইতিহাসের বিরোধিতা করে। কিন্তু লিখিত ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে না ব'লে কি তাকে অবাস্তব বলা যায়? পূর্বস্থলীর এক মানুষের কাছে দৃশ্যত-অনেকাংশেই-ভিন্ন এক পর্যটকের 'বলা' নামপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা ভাষার ঐতিহ্যের কথা ভাবলে যথেষ্টই

সঙ্গত। ধর্ম ও দর্শন প্রসঙ্গে বারংবার আসে হিন্দু ধর্ম ও খ্রিষ্ট ধর্মের কথা, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের একবারও উল্লেখ থাকে না। কিন্তু আখ্যানটিকে অন্যভাবে পাঠের সুযোগও থেকে যায়। সেই যে হরিণী, যাকে হত্যা করা হয়েছিল মাংসের লোভে, সেই সম্বন্ধীয় পাপবোধ, মৃত্যুচেতনা--- এই সমস্তকিছুর মূলে যেমন সেই বাজার ব্যবস্থা, তেমনি এই ধর্মগুলির প্রভাবও পাশাপাশি থাকতে পারে। এই দুই কারণেই মধু এত সংবেদনশীল হয়ে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে কারণগুলির কোনো পারস্পরিক বিবাদেরও প্রয়োজন পড়ে না।

এই মত যদি ধ'রে নেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয়, লিখিত ইতিহাসের কিছু তথ্য আখ্যানগুলিতে গৃহীত হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই তথ্য নির্বাচনের নির্দিষ্ট রাজনীতি রয়েছে, যা বহুত্বের কথা বলে।

উল্লেখ্য, ওয়াল্টার বেঞ্জামিন তাঁর 'On the Concept of History' শীর্ষক রচনাটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন,

> 'Among the most noteworthy characteristics of human beings', says Lotze, 'belongs... next to so much self-seeking in individuals, the general absence of envy of each present in relation to the future." This reflection shows us that the picture of happiness which we harbor is steeped through and through in the time which the course of our own existence has conferred on us. The happiness which could awaken envy in us exists only in the air we have breathed, with people we could have spoken with, with women who might have been able to give themselves to us. The conception of happiness, in other words, resonates irremediably with that of resurrection [Erloesung: transfiguration, redemption].
>
> It is just the same with the conception of the past, which makes history into its affair. The past carries a secret index with it, by which it is referred to its resurrection. Are we not touched by the same breath of air which was among that which came before? is there not an echo of those who have been silenced in the voices to which we lend our ears today? have not the women, who we court, sisters who they do not recognize anymore? If so,

> then there is a secret protocol [Verabredung: also appointment] between the generations of the past and that of our own. For we have been expected upon this earth. For it has been given us to know, just like every generation before us, a *weak* messianic power, on which the past has a claim. This claim is not to be settled lightly. The historical materialist knows why. (Benjamin 1974).

অতএব কল্পিত হলেও এই আখ্যানের সম্পর্কে এই রকম অভিযোগ আর ন্যায্য থাকে না যে, তা বাস্তব থেকে পাঠককে বিচ্যুত করে। বরং বাস্তবের যে সূক্ষ্ম চেহারা এই লিখিত ইতিহাসে ধরা যায় না, তাই কল্পিত এই অতীতে ধরা পড়ে। তবে কি আখ্যানগুলি লিখিত ইতিহাসকেই আরও প্রসারিত করে? না, আখ্যানগুলির উদ্দেশ্য তা নয়। তা হ'লে এই ইতিহাস যে 'আমি'-র কথা বলে, তা আখ্যানগুলিতে প্রকাশিত 'আমি'-র সাথে কোনো বিরোধ রেখে চলত না। এরা চরিত্রগতভাবে পৃথক ও পরস্পরবিরোধী। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অতীতের নিরিখে আত্মানুসন্ধানই আখ্যানগুলিতে কেন্দ্রে রয়েছে। লিখিত ইতিহাস থেকে তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে কেবলমাত্র আখ্যানের গ্রহণযোগ্যতার স্বার্থেই। মধুর সময়ে গ্রহণ ও ঔদার্য্য যেখানে মুখ্য বিষয়, আসফাকের বঞ্চনা সেখানে স্বাধীন ভারতের সময়কালে মুখ্য। এ তো আসলে অন্ধকারেই যাত্রা, অথচ আধুনিকতা তা বলেনি, বলেছিল আলোর দিকে যাত্রার কথা। এই অন্ধকার নির্দেশের পিছনে কোনো ধর্মজ্ঞান কাজ করছে না। অর্থাৎ কখনো কোনো সুবর্ণ যুগ ছিল, আবার তা ফিরে আসবে বা এই অন্ধকার প্রকৃতপক্ষে কোনো পুঁথি নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুতির কারণে এসেছে, এ হেন কোনো ইঙ্গিত নেই। 'মধু সাধুখাঁ'-র সময়কে বহুস্তরীয় 'আমি'-র প্রকাশের দিক থেকে এগিয়ে রাখলেও সেই যুগকে সুবর্ণ যুগ বলা যায় না। সে সময়ে সতীদাহ প্রথা ছিল। উপন্যাসে তার উল্লেখের সাথে সাথে আখ্যানকার নিয়ে আসে

ভয়ের প্রসঙ্গ, হাহাকারের প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সতীদাহ যে অনাকাঙ্ক্ষিত, তা স্পষ্ট। বরং নৈতিকতা এবং ঔচিত্য এখানে গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশি। ফলত চক্রাকার কোনো গতিও এখানে নেই।

মধুর নির্দিষ্ট সময়কে ধরতে হ'লে ভাবতে হয়, সমসাময়িক কোন কোন ঘটনা বঙ্গপ্রদেশে ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বলে বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা। তাতে তৎকালীন সমাজ প্রসঙ্গে কিছু জানতে পারা যায়। কিন্তু তা থেকে কামরূপ সমসাময়িক সমাজ-অবস্থা বোঝা তো কার্যত অসম্ভব। অতএব, কল্পনাই রাস্তা, যে কল্পনা ভাষা পাবে কোচবিহারেরই রাজা নরনারায়ণের লেখা একটি চিঠির ভাষাকে 'মডেল' মেনে(বাংলা গদ্যভাষার আদিতম নিদর্শন), যে কল্পনা মূলত কথা বলবে নির্দিষ্ট সেই সমাজব্যবস্থায় থাকা 'values' নিয়ে। তাকে বুঝতে চেয়েই আদতে এই কল্পনাপ্রকল্প, তথ্যের অভাবে রৈখিক ইতিহাসের পক্ষে যা কখনোই আর সম্ভবপর নয়। ফলত অভিভূত হয়ে যেতে হয় ঘাই হরিণী হত্যার দৃশ্যে, যেখানে সদ্য রান্না করা সেই হরিণীর মশলাদার, চর্বিযুক্ত মাংস খেতে খেতে বলা'র সাথে কথোপকথনকালে একইসাথে মধু গভীরভাবে ভাবিত হয় সেই হরিণীর কামনা, তার যৌনতা নিয়ে। এই 'value'[11] তো আসলে সেই নির্দিষ্ট বাজারব্যবস্থাতেই সম্ভব, যেহেতু কেউই সেখানে পরিত্যাজ্য নয়, স্বতন্ত্র-বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও সবাই এক বৃহৎ 'আমি'-র অংশ। যে অতীতকে রৈখিক ইতিহাস ধরতে পারেনি কখনো, সেই ইতিহাসকে 'trace' করবার একমাত্র রাস্তা যদি কিছু খোলা থাকে, তবে তা কল্পনা। সেই কল্পনার ভিত্তি-উপাদান আসে রৈখিক ইতিহাস যেভাবে সেই সময়কে চিনিয়েছে, তার থেকেই। কারণ কোনো বিষয়কেই কিছু স্থানাঙ্ক ব্যাতিরেকে বোঝা সম্ভব নয়। অমিয়ভূষণের আখ্যানেও যে অতীতকল্পনা চলে, তাতে রৈখিক ইতিহাস

[11] এই 'value' বলতে এখানে বলতে চাইছি সেই মূল্যবোধ, যা সমাজ ও বাজারসাপেক্ষ, সেই বোধ যা মানুষের অন্য মানুষ বা বস্তুর সাথে সম্পর্ক কী রকম হবে, তার নির্ণায়ক হয়।

এই কাজটিই করে। কিন্তু যদি সব ক্ষেত্রেই স্থানাঙ্ক হিসেবে এই কল্পনা রৈখিক ইতিহাসের সাহায্য নেয়, তাহ'লে তো শেষ পর্যন্ত তার আর স্বতন্ত্রতা থাকে না। এই আখ্যানগুলিও নিশ্চিতভাবে সেই কারণেই রৈখিক ইতিহাসকে সরাসরি অস্বীকার করে। 'রাজনগর' উপন্যাসে এক স্থানে রাজচন্দ্র নিজের মনে ভাবে, সময় তো কেবলই নদীর মত নয়, সেও তো কখনো দহের আকার নিয়ে থেমে থাকে। এই ভাবনাই কি অমিয়ভূষণকে রৈখিক ইতিহাসকে অস্বীকার করতে বাধ্য করায়? নাকি রৈখিক যে ইতিহাস উনবিংশ শতাব্দী থেকে লেখা শুরু হচ্ছিল, তার পিছনে যে নির্দিষ্ট আঞ্চলিক জাতীয়তাবোধ ছিল, তাকে অস্বীকার করতে চান অমিয়ভূষণ? কারণ এই জাতীয়তাবোধই নির্দিষ্ট পথে বিবর্তিত হয়ে স্বাধীন ভারতে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর 'শুধুমাত্র রাজবংশীদের জন্য' পৃথক রাজ্যের দাবি করে। অথচ তাঁর উপন্যাসগুলি তো সম্মিলিত ভাবে সেই কথা বলে না।

'মধু সাধুখাঁ' উপন্যাসে মধু নদীর দুই তীরে যে মাটিকে রেখে চলেছে, সেই কামতার অতীত সম্পর্কে বলাকে জানাতে গিয়ে একটি গল্প বলে। তা তার শোনা কথা। গল্পটি এই রকম-

> এই বংশের আগের বংশের শেষ রাজা ছিলো নীলাম্বর এই কামতায়। নীলাম্বরের এক রাণী বনমালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহর তাকে কৃষ্ণকীর্তন প'ড়ে গেয়ে শোনায়। মন্ত্রী শশী পাত্রের পুত্র মনোহর। হাতে-নাতে ধরা পড়লো একদিন মনোহর। রাণী হলেও ও গোপন করা যায় না—যাকে বলে ব্যাভিচার। ক্রমে সাহস বাড়ে আর তাতে অনর্থ। বিচারে মনোহরের প্রাণদন্ড। আর প্রাণদন্ডের অপরাধীর বলি এর আগেও হয়েছে চন্ডী-চামুন্ডার সামনে। রোজ পূজা কামতায়। তিথিতে-তিথিতে নরবলি। একরাতের পূজায় মনোহরকে বলি দেয়া হলো, ছান করিয়ে এনে ভিজে কাপড়ে হাঁড়িকাঠে ফেলে। কেউ বলে পৈতাসমেতই ছিলো। তা না-হলেও শশী পাত্র ব্রাহ্মণ, তার পুঁতও গোসাই হবে। সেই থেকে গোসানিমারী নাম। (মজুমদার ১৯৮৮, ৩৯)

উল্লেখ্য, এই গোসানিমারী কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার একটি স্থান, যার নামকরণ একটি মন্দিরের থেকেই—গোসানিমারী।

এবার দেখা যাক, ইতিহাসের তথ্য এই মন্দির নিয়ে কী কথা বলে! ড. নৃপেন্দ্রনাথ পালের ‘ইতিকথায় কোচবিহার’ গ্রন্থে কোচবিহারের মন্দিরগুলি নিয়ে যে আলোচনা রয়েছে, তার শিরোনাম ‘গোসানীদেবীর মন্দির’। কার্যত, মৌখিক আখ্যানও এর স্বপক্ষে যুক্তি দেয়। এই নাম ‘গোসানিমারী’ নামটির সাথে বিরোধ রাখে না, দু’টি নামই প্রচলিত। যেহেতু এদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, সুতরাং ভাষার আঞ্চলিকতার প্রসঙ্গকে মনে রেখে এমন অনুমান করাই সঙ্গত যে, ‘গোঁসাই মা’< ‘গোঁসাই মাঈ< ‘গোসানি মাঈ’< ‘গোসানিমারী’—এইভাবেই এই নামের উৎপত্তি। স্থানীয় মানুষের মৌখিক আখ্যান এর স্বপক্ষেও যুক্তি দ্যায়, বরং ‘মধু সাধুখাঁ’-র সেই গল্পই তাঁদের অজানা। অতএব, রৈখিক ইতিহাসের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে তাকেই আরও বিস্তৃত করবে, এরকম কোনো উদ্দেশ্যের কোনো লক্ষণ এই আখ্যানগুলির নেই। আবার যে দুনিয়ার সন্ধান রৈখিক ইতিহাস দ্যায়, তাকে খারিজ ক’রে দেওয়াই আছে। এই খারিজ যাতে মজবুত হয়, তার কারণেই তথ্য ব্যবহার। একটি রূপক এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ যেন এক বাস্তববাদী ছবি অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে আঁকা, যে ছবি মনে করায় অন্য দৃশ্যকে, অন্য কোনো স্মৃতিকে, যা সম্পর্কে দর্শক পূর্বজ্ঞাত। তারপর সেই ছবিকেই রঙ-কাঁচা-থাকা-অবস্থায় তুলি দিয়ে ঘেঁটে দিয়ে বানানো এক দ্বিতীয় ছবি, যা স্পষ্টতই ভিন্ন, কিন্তু প্রথম ছবির স্মৃতিকেও মনে করাবে। অমিয়ভূষণের আখ্যানগুলিও সে রকমই।

প্রসঙ্গত আবারও উল্লেখ্য ‘Walter Benjamin’-এর ‘On the Concept of History’ শীর্ষক রচনাটি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের বক্তব্য,

> The chronicler, who recounts events without distinguishing between the great and small, thereby accounts for the truth, that nothing which has ever happened is to be given as lost to history. Indeed, the past would fully

> befall only a resurrected humanity. Said another way: only for a resurrected humanity would its past, in each of its moments, be citable. (Benjamin 1974)

স্থানবিশেষে কোনো রকম দ্বন্দ্ব না রেখেই রৈখিক ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে মেনে নেয় 'মধু সাধুখাঁ'-র আখ্যান।

> ঘুম হবে কি হবে না এক দুশ্চিন্তা ছিলো না মদু সায়েদের। সে ভাবলো বরং, আর হাসলো ভাবতে গিয়ে; এই কামতায় শুক্লধ্বজ, নীলধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক তুরবাক খাঁয়েরা, শেষে হুসেন শা আর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু? বরবাক বা তুরবাক মারের চোটে করতোয়া বেয়ে পালিয়েছিলো, গৌড়ে না-পৌঁছে থামেনি। বারো বছরের চেষ্টায় হুসেন শা কামতাজয়ী, কিন্তু নিজ বেটা দানিয়েলকে দিলো বেঘোরে। তারপর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখো আর একে যৌবন পায়। এক না-ব'লে দু'জনা বলা ভালো। মদু, তুমি ধুবড়ির কাছে সেনাপতির ছেলে রঘুকে দেখেছো, আর এখানে ঠাহর করো—রাজার ছেলে লক্ষ্মীকে দেখবে। দুই-ই যুবক। মনে হয় না তারাও ঘাই-এর ডাক শুনেছে? ওদিকে দক্ষিণে ঘোড়াঘাটের আশেপাশে শাবাজ খাঁ মুগোল। (মজুমদার ১৯৮৮, ৩৩-৩৪)

কিন্তু, লক্ষ্যনীয়, এই তথ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে আখ্যানে রাখবার ঠিক পরেই এই সম্পর্কে মধুর এক মতামত থাকে, যাকে পুষ্ট করে ঘাই হরিণীর ডাকে ধেয়ে আসা কামার্ত যুবক হরিণের স্মৃতি। অর্থাৎ সামগ্রিক মুহূর্তের যতটুকু অংশ ইতিহাসে স্থান পেল, তাকে সেই সমাজের নির্দিষ্ট 'values'-এর মাধ্যমে দেখতে চাওয়া থাকে। এই দেখতে চাওয়াকে আসলে রৈখিক ইতিহাসের 'আংশিকতা' 'অসমগ্রতা'-কেই নির্দেশ করার কৌশল হিসেবেই পড়ার দিকে ঝোঁক আসে। আখ্যানকারের সেই ছবি ঘেঁটে দেওয়ার কৌশলটির উদ্দেশ্য এই ঝোঁকটি তৈরি করাতে নিহিত।

'রাজনগর' উপন্যাসটি কথা বলে মহাবিদ্রোহের পরবর্তী সময়কালকে নিয়ে, যখন রাজনগর ক্রমে ইংরেজদের মাধ্যমে শিল্পবিপ্লব-কেন্দ্রিক আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে। এই রাজনগরে কখনোই ইংরেজরা আর শাসক হয়ে উঠতে পারে না। উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র কোনো একজন নয়। রাজচন্দ্র এমনই একটি চরিত্র, যে রাজকুমার। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় সে পুরোপুরি শিক্ষিত হয়ে ওঠেনি তার অল্প বয়সে। ফলত কৈশোর-উত্তীর্ণ মনে তার আশঙ্কা হয়,

রেভারেন্ড বাগচীর স্কুলে যে ছেলেরা পড়ে, তারাও কয়েকদিন পরে তাদের রাজকুমারকে অশিক্ষিত ব'লে অপমান করার উপযুক্ত হয়ে যাবে! চরিত্রটি যেভাবে পুরো উপন্যাসে বিকাশলাভ করে, তাতে দেখা যায়, রাজচন্দ্র প্রকৃত অর্থেই এক আধুনিক চরিত্র। সে অতীত এবং বর্তমানের টানাপোড়েনে দ্বিধান্বিত, সবসময় পক্ষ নিতে পারবেই—এমনটা ঘটে না, রাজা যে ঈশ্বর নয়, এই উপলব্ধিও তার হয়। তার বিয়ে ঠিক হয় গুণাঢ্য মশাইয়ের কন্যার সাথে। বিয়ে নিয়ে কিছু একটা ঝামেলা নাকি হয়েছিল! এই গুণাঢ্য মশাই ব্রাহ্ম লোক। রাণীমার সাধ, বিয়ে হিন্দুমতেই হোক! বিয়ের দিন রাজচন্দ্রের তখন বিয়েতে সাধ না থাকায় তার সাথে এ বিয়ে হয় না। গল্পটা রাজবাড়ি থেকে সম্মান রক্ষার্থে এই প্রচার পায় যে, আসলে 'কায়েত বাড়ির কুমারও এ বাড়িরই রাজকুমার, বরং সেই জ্যেষ্ঠ এবং তার নামটা অত বড়—মুকুন্দবিলাস স্মৃতি'।

এখন আধুনিক রাজকুমার, যে অবশ্যই পরে রাজা হবে, যার সাথে বিয়ে হবে এক ব্রাহ্ম মেয়ের, যে মেয়ের বাবা আবার ব্রাহ্মসমাজের প্রধানস্থানীয়, সেই বিয়েকে কেন্দ্র ক'রে গন্ডগোল---এই সবই মনে করায় কোচবিহারের রাজা ভুপবাহাদুর মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের কথা, ইতিহাস যাঁকে কোচবিহার শহরের 'আধুনিক রূপকার' হিসেবে চিহ্নিত করে।[12] তাঁর বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে এবং যে ব্রাহ্মরা বাল্যবিবাহবিরোধী, তাদেরই শীর্ষস্থানীয় কেশবচন্দ্র রাজপরিবারে-মেয়ের-বিয়ে-হবে--- কেবলমাত্র সেই উদ্দেশ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের এই বিয়েতে সায় দিয়েছেন, এই যুক্তিতে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয় এবং কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মসমাজে আর খুব একটা প্রভাব বিস্তার করার স্থানে থাকেন না। যদিও নৃপেন্দ্রনারায়ণ রাজা হয়েছিলেন, যদিও আখ্যানে বিয়েকে কেন্দ্র ক'রে যে ঝামেলা হয়েছিল, তা ভিন্ন, তবুও এ তো আসলে পূর্ব-উল্লিখিত সেই ছবির

[12] ইউরোপীয় সংস্কৃতির নিরিখে এই আধুনিকতা

রূপকেরই পুনরাবৃত্তি। প্রথম ছবি যাতে অবোধ্য হয়ে যাওয়ার মত আবছা হয়ে না যায়, তার জন্য তাতে থাকে ছিটমহলের প্রসঙ্গ, পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডানকানের চা চাষ শুরু করা, ইংরেজের জৌলুশের বশবর্তী হয়ে রাজবাড়ির সিংহ দরজা নতুন ক'রে বিপুলাকারে বানানোর প্রসঙ্গ, রাজনগরের রেলস্টেশন তারাবাড়ি সেই লাইনের শেষ স্টেশন—এই তথ্যের উল্লেখ। আবার সেই ছবিকে ভাঙতে পূর্ব-উল্লিখিত ঘটনাগুলির পাশাপাশি থাকে ছিটমহলের সাথে ফরাসী উপনিবেশের প্রসঙ্গকে জুড়ে দেওয়া, রাজনগরের উপর দিয়ে গঙ্গাকে বইয়ে দেওয়া। যদিও গঙ্গাকে কেন অমিয়ভূষণ রাজনগরের উপর দিয়ে বওয়ালেন, তা স্পষ্ট নয়। শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট ছবি বা প্রসঙ্গকে অস্পষ্ট করাই যদি তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, তাহ'লে অন্য কোনো নদীর কথা আসতে পারত। গঙ্গার সাথে সাথে কি পুঁজির বিকাশের অন্য অনুষঙ্গও আসে না? সেই অনুষঙ্গের 'contrast' হঠাৎ ক'রে তার এই আখ্যানে আনবার কথা নয়, আনলেও তার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি থাকত। যে রাজনগরের কাছাকাছি আসাম, যেখানে ছিটমহল আছে, ডানকান যে অঞ্চলে চা চাষ করা শুরু করে, সেই অঞ্চলে গঙ্গা বয়ে যাওয়া তো অস্বাভাবিকই বটে।

'মহিষকুড়ার উপকথা'-তে রৈখিক ইতিহাসের সাথে ডায়লগ তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাস্তায়। তা পূর্ববর্তী ধরণগুলির মত নয়। ফলত ছবি ঝাপসা ক'রে দেওয়ার কৌশলটিও এখানে অনুসৃত হয়নি। মহিষকুড়ার আখ্যানের সময়কাল স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে, যখন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই অঞ্চল এবং সেই সুবাদেই এখানে আধুনিক শহরব্যবস্থার ছোট-ছোট নিদর্শনগুলি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে আর বন ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে, যখন গণতন্ত্র, নির্বাচন—এ সম্পর্কে সবাই পরিচিত হচ্ছে (ফলত জাফরুল্লা 'পঞ্চায়েত পিধান' হয়), হরিণ মারা যখন আইন ক'রে নিষিদ্ধ হয়েছে। স্পষ্টতই পূর্বের সূত্র ধ'রে বলা যায়, মহিষকুড়ার উপকথা এমন এক সময়কালের কথা বলে, রৈখিক ইতিহাস যাকে ইতিহাস হিসেবে ধার্যই করেনি। ধার্য না করার কারণে কোচবিহারের ইতিহাস

আদতে কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস হিসেবেই থেকে গেছে, স্বাধীন ভারতের এক জেলা কোচবিহার কী ক'রে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ পেল, তা বোঝার সুযোগ আর সেখানে থাকেনি। এই ক্রমবিবর্তনের ধারাটিই ধরা পড়েছে এই উপন্যাসে। যদিও তা খুব দীর্ঘ এক সময়কালের কথা বলে না। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের কথা বলে। এই সময়কাল গুরুত্বপূর্ণ কারণ কোচবিহার ১৯৪৯ সালে যুক্ত হচ্ছে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতবর্ষের সঙ্গে, ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থা বিকাশলাভের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়েই যে স্বাধীনতা লব্ধ হয়েছিল। ফলত সেই ভারতবর্ষে আধুনিক শহর ছিল, তাকে কেন্দ্র ক'রে ছিল এমন এক নির্দিষ্ট সমাজ, যার সঙ্গে এতদিনের কোচবিহারের বাজারব্যবস্থার প্রচুর পার্থক্য। এই বাজার সামন্তব্যবস্থা মেনে বহুলাংশেই ছিল কৃষিকেন্দ্রিক, অতএব জমির রাজনীতি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেই একই কারণে আখ্যানেরও মূল প্রতিপাদ্য, হঠাৎ ক'রে পালটে যেতে থাকা নিজের পরিপার্শ্বের সাথে নিজেকে না মেলাতে পারার সংকট, যা আদতে দুই ভিন্ন ইতিহাস একে অপরের সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ডায়লগ তৈরি করার ফলশ্রুতি হিসেবে আসছে। আসফাক নিজের যে অতীতের সাথে পরিচিত, সেই অতীত তাকে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত যে ধারণা দিয়েছিল, তা অন্য এক ইতিহাসের সাথে ডায়লগ তৈরি করতে গিয়ে পথ পালটে নেয়। আসফাক, যে এই সময়ের প্রতিনিধিত্ব করে, তার সন্তান ক্ষমতাবান জাফরুল্লার দখলে থাকে। যে আদিমতার বিরুদ্ধ স্বর এই আধুনিক হ'তে থাকা পৃথিবীতে আসফাক বাঁচিয়ে রেখেছিল, তা আর কোথাও সংক্রামিত হবে না। কারণ—

> এই কথাটাই মনে পড়ছে আসফাকের বলদগুলোকে খোঁটায় বাঁধতে বাঁধতে—সেই যে এক সাহেব গল্প করেছিল, কোচবিহার শহরে এক রাজা শেষ বাইসন-মোষটাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর আর বুনো মর্দামোষ কারো চোখে পড়েনি। এদিকে বুনো মোষ নিশ্চিহ্ন।

> এ তো বোঝাই যাচ্ছে, শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামতো বনে চরতে আর কোনোদিনই দেবে না। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে। (মজুমদার ১৯৮১, ৯০)

আসফাক, মধু, রাজচন্দ্র, বাগচী, হরদয়াল--- এরা সবাই ভিন্ন ও নির্দিষ্ট শ্রেণির। এই আলোচনায় যেভাবে আমরা তিনটি উপন্যাসকে একত্রে একটি অতীতকল্পনা-প্রকল্প হিসেবে দেখতে চাইছি, তাতে 'আমি' এবং 'অপর'-এর সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে তিনটি সময়কাল তিনটি উপন্যাসে রয়েছে, খুব মোটা দাগে সেই তিন পর্বে নির্দিষ্ট সেই-সেই তিন পৃথক শ্রেণির বিবর্তন ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, সেই সময়গুলি নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে মূলত সেই শ্রেণিগুলিই। জমি, জমির সূত্রে জ্ঞাত অভিজ্ঞতা ও এক ক্রমপরিবর্তনশীল ও সবক্ষেত্রেই অপরিবর্তিত 'ইংরেজ' 'অপর'--- এই সবকিছু উপাদানগতভাবে এই তিন শ্রেণিকে একত্রে এক বহুস্তরীয় 'আমি'-তে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যে কেবল নদীর স্রোতের মত কেবলমাত্র এগিয়েই গিয়েছে এমন নয়, অনেক ক্ষেত্রেই তলে-তলে দহের মত থেমেও থেকেছে একই সময়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি অমিয়ভূষণ: ক্রমনির্মীয়মান ‘আমি’ এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে ‘নাগরিক’-এর ‘ঔচিত্যবোধ’

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর শৈশবে কোচবিহারে পৈতৃক বাড়িতে যাতায়াত করলেও তাঁদের পরিবার পাকাপাকিভাবে কোচবিহারে থাকা শুরু করে দেশভাগের পর। তাঁর বাবা অনন্তভূষণ সপরিবারে পালিয়ে কোচবিহারে আসেন প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে। অতএব, এই আসা আগের আসাগুলির মত ছিল না। এইবার তাঁরা বাধ্য হয়ে এসেছিলেন। ফিরে যাওয়া আর তাঁদের ইচ্ছাধীন ছিল না। পাবনায় তাঁদের নিজস্ব জমিদারি ছিল, এখানে তাঁরা এবারে এলেন উদ্বাস্তু হয়ে। দুইক্ষেত্রে দুই ভিন্ন পরিচিতি। যে জমি ছিল স্বচ্ছলতার মূলে, সেই জমি পায়ের নীচ থেকে সরে গেল, অসহায়তাকে মাথায় নিয়েই অন্য এক পূর্ব-পরিচিত মাটির সাথে শুরু হ'ল তাঁর নিজস্ব কথোপকথন। এমনটা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না, যে মানুষটি নিজের জমি-জিরাত-স্মৃতি সব ছেড়ে বাধ্যত নতুন একটি স্থানে আসবে, সে নিজস্ব পদ্ধতিতে সেই নতুন স্থানের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করবার চেষ্টা করবে, সেই স্থানের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস—এই সবকিছুকেই নতুন ক'রে দেখতে চাইবে, তাদের সাথে কথোপকথনে যাবে নিজের স্মৃতিকে পুঁজি ক'রে।

নিজের 'displacement' সম্পর্কে সচেতন হওয়া মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সচেতন চেষ্টা চালায় নিজে কে?—কী তার উদ্দেশ্য?—কী তার গন্তব্য?--- এই প্রশ্নসমুহের উত্তর খোঁজার। ফলত কোচবিহারের অতীত নিয়ে সচেতনভাবে ভাবিত হওয়া অমিয়ভূষণের কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। এই ভাবনা মেটানোর সহজ উৎস ছিল লিখিত ইতিহাস। কিন্তু তা কেবল একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ঝাড়াই-বাছাই ক'রে নেওয়া পছন্দসই কতগুলি তথ্যের সজ্জা হ'ত। কিন্তু ইতিহাস মানে তো আদতে সেই তথ্যাবলীর অভিজ্ঞতাও!

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, কোচবিহারের আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রথম আধুনিক নিদর্শন বলা যায় ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটিকেই। তারপর ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদের বইটি উল্লেখ্য। এই দু'টি গ্রন্থেই ইতিহাসের রৈখিকতা বজায় থেকেছে। কিন্তু হঠাৎ অমিয়ভূষণ তাহ'লে তাঁর উপন্যাসগুলিতে এই রৈখিকতার বাইরে বেরোলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মানুষের নতুন ক'রে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন পরিচিতি নিয়ে নতুন স্থানের সাথে তার সম্পর্ক, তার শিকড় গ'ড়ে তুলতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষার সূত্রে।

একটি পরিত্যক্ত খসড়া থেকে দেশভাগ প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণের মতামত জানতে পারা যায়।

> non-secular হওয়ার ভয়ে, ভোটের আশায় যা বলা হয়, তা ইতিহাস নয়, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়। ঐতিহাসিক ভাবেই দেশভাগ অনিবার্য ছিল। দ্বিজাতি তত্ত্ব ও পাকিস্তানকে সমর্থ করলে দেশভাগকে সমর্থন করা ছাড়া উপায় কী? আমাদের Marxist বন্ধুরা পাকিস্তান সমর্থক ছিল। দেশভাগ না হলে '৪৬-এর কলকাতা সারা দেশ জুড়ে দফায় দফায় হত। আমরা '৪৬-এর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান দেখেছি। atom bomb-এর সামনে অহিংস হতে বলা যেমন অবাস্তব, মহাত্মা গান্ধির ভারতবর্ষকে অখন্ড রাখার ইচ্ছা তাঁর মহত্ত্ব সূচনা করতে পারে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুকে রোধ করতে পারত না, তা বলেই তা অবাস্তব। জিন্নাকে কখনই পাকিস্তান চাওয়া ও দ্বিজাতি তত্ত্ব থেকে সরানো যেত না। গোটা ভারতকে জিন্নার হাতে তুলে দিলেও না। (এণাক্ষী মজুমদার ২০১৭, ১৯৪)

আবার, অমিয়ভূষণের কন্যা এণাক্ষী মজুমদার বাবার দেশভাগের স্মৃতি প্রসঙ্গে "দেশত্যাগের বৃত্তান্ত অথবা একটি 'নন-সেকুলার' আখ্যান" শীর্ষক রচনায় লিখেছেন,

> ১৯২৬ থেকে ১৯৪৬। অনেকটা সময়। এর মধ্যে (১৯২৭ থেকে) বেশির ভাগই কেটেছে দেশীয় রাজ্য কুচবিহারে। সেখানে আইনকানুন আলাদা। হিন্দু-মুসলমানে লড়িয়ে দিয়ে মজা দেখার মত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, কিংবা দাঙ্গাবাজদের মদত করার মত পুলিশ-আমলা সেখানে ছিল না। তার চাইতেও বড় কথা হিন্দু বা মুসলমান কারোরই সেখানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করার মনোবৃত্তিও ছিল না। কুচবিহারে

> মুসলমানের সংখ্যা কম বলে নয়, আসল কথা হল কুচবিহারি কালচার। (না হলে তো সাতচল্লিশের পরে যখন উদ্বাস্তুতে কুচবিহার ভরে গেল তখন খুনোখুনি হত। তা তো হয়নি।) (এণাক্ষী মজুমদার ২০১৭, ১৯৬)

কোচবিহারে দেশভাগের সময় থেকে উদ্বাস্তুরা বিপুল সংখ্যায় আসতে থাকেন। কোচবিহার বাংলাদেশের রংপুর সংলগ্ন অঞ্চল হওয়ায় অভিবাসনের জন্য তা সহজগম্য ছিল। কোচবিহার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাবত মানুষেরই নতুন এক পরিচিতি নির্মিত হ'ল—ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক। কোচবিহারে মূলত কেউ তা পেল সামন্তব্যবস্থার পরিচিতিসমূহের ইতিহাসকে মনে রেখে, কেউ পেল পূর্ব পাকিস্তানের পরিচিতির স্মৃতিকে রেখে। যে স্থান উপনিবেশের ইতিহাস নিয়ে ক্রমশ নিজেকে পরিণত করেছে গণতন্ত্র প্রাপ্তির জন্য, কোচবিহার তেমন নয়। রাজার অধীনে থাকা দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ নিয়েই এখানকার বৃহদাংশের মানুষ ভারতভূক্তির পর মুখোমুখি হয়েছে 'গণতন্ত্র', 'নির্বাচন'--- এ' হেন শব্দগুলির সঙ্গে। যখন তাঁরা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তখন রাজত্ব না থাকলেও রাজা আছেন, রাজবাড়ি আছে। অতএব 'hierarchy'-র সেই বোধটিও সম্পুর্ণ অবলুপ্ত নয়। এত দ্রুত সেই বোধ অবলুপ্ত হওয়া কার্যত সম্ভবও ছিল না। কোনো জনগোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধ'রে নিজেদের অধিকার ও নিজেদের সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট এক ধরণের মানসিকতা পোষণ ক'রে আসার পর কোনো একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে রাতারাতি সেই বোধ, সেই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটা সম্ভব নয়। সেই বোধ নিয়েই তাঁরা সামাজিকভাবে ক্রমশ অন্তর্গত হচ্ছেন ভারতবর্ষের সামগ্রিক এক ইতিহাসে, যে ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, যে ইতিহাসলিখন উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের ফসল। সেই ইতিহাসে স্বাভাবিকভাবেই এক বাইনারি আছে ভারতবাসী ও ইংরেজের। এবং সেই সূত্রেই মুসলমান শাসকদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে বহিরাগত হিসেবে। আবার কোচবিহারের নিজস্ব ইতিহাসে অন্তত লিখিত প্রমাণগুলির কোথাও

তখনও সে রকম কোনো বাইনারি নেই। এই মিশ্র ইতিহাস নিয়ে তাঁরা ক্রমশ নির্বাচন পদ্ধতিতে সক্রিয় হচ্ছেন। নির্বাচন প্রক্রিয়ার এই বোধ তৈরি করার কথা ছিল যে, দেশের নেতাকেও নির্বাচন করা যায় এবং যে কোনো ব্যক্তি মানুষ সেই প্রক্রিয়ায় সম পরিমাণ গুরুত্ব পায়। কিন্তু যেখানে পূর্বোল্লিখিত সেই 'hierarchy'-র আবেগ স্পষ্ট, যেখানে নির্বাচন মানুষকে যে অধিকার দেয় এবং ঔচিত্যের যে বোধ তৈরি করে, তা গ্রহণ করতে মানুষ তখনও প্রস্তুত নয় (সমাজবিকাশের ক্রমে ফাঁক থেকে যাওয়ার কারণে), স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচনের এই সুযোগ আসার পরও কিন্তু এখানে পৃথক কামতাপুরের দাবিতে গ্রেটার আন্দোলন ছাড়া একেবারে নিজস্ব কোনো গণ-আন্দোলন সংঘটিত হল না। এই আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, রাজবংশীদের পৃথক রাজ্য দিতে হবে, যে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা থাকবে তাদেরই হাতে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই শাসনব্যবস্থা হবে রাজাভিত্তিক। পৃথক রাজ্য দাবি করবার পিছনে কারণ হিসেবে তাঁরা দেখালেন, কোচবিহারের ভাষা বাংলা ভাষা থেকে আলাদা। বাংলা ভাষারই যে একটি রূপভেদ কামতাপুরি ভাষা, তা তাঁরা মানতে চাইলেন না। অতএব, যুক্তি শেষ পর্যন্ত এই হ'ল, ভাষা আলাদা, অতএব সংস্কৃতি আলাদা। অতএব, সংবিধান মেনেই পৃথক রাজ্য দাবি করা সঙ্গত। এই দাবিকে রাজবংশীদের যে অংশ সমর্থন করলেন, তাঁরা তাঁদের রাজাকে নির্বাচন করলেন ও পৃথক রাজবাড়ি নির্মিত হল। তার জৌলুস যদিও রাজবাড়ি-সুলভ নয়। কেন পৃথক রাজবাড়ি? মূল রাজবাড়ি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রদর্শনশালা। অতএব, তা দখল করতে গেলে যা করতে হয়, তা সরাসরি দেশদ্রোহের সামিল। এখন, রাজা পাওয়া গেল, কিন্তু নির্বাচিত রাজা। আবার গণতান্ত্রিক দাবি প্রথমেই যা করল, তা বিচ্ছিন্নতার দাবি তোলা।

কিন্তু শুধুই কি তাই? এই পৃথক রাজ্যের শাসনব্যবস্থা হিসেবে তাঁরা আবার ফিরে যেতে চাইলেন সামন্তব্যবস্থায়। এমনকি ভূমিবন্টনব্যবস্থায় যখন সাধারণ মানুষ[13] জমির অধিকার পেল, সেই আন্দোলনের সাথেই যারা জড়িত ছিলেন, মৌখিক আখ্যান এই সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা পরবর্তীকালে সেই ঘটনার রেশ ধরেই বলা শুরু করলেন, নতুন রাজ্যব্যবস্থায় সেই জমি কেড়ে নেওয়া হবে এবং তাঁরা নিজেদের মালিকানায় তা আনবেন।

এমতাবস্থায় যখন বিচ্ছিন্নতার কথা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যখন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমশ আবার উল্টো পথে হাঁটবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তখন অমিয়ভূষণের এই উপন্যাসগুলি সেই অঞ্চলের ইতিহাস-সচেতন পাঠকের চোখে বিশেষভাবে পড়ে।

অমিয়ভূষণের উপন্যাস তিনটিতে যারা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি নিয়ে আছে, তারা বিভিন্ন শ্রেণির লোক, তারা বিভিন্ন ধর্মের লোক। রাজচন্দ্র ও মধু হিন্দু, মাষ্টার বাগচী খ্রিষ্টান, আসফাক, কমরুন মুসলমান। মাটির সাথে, অঞ্চলের সাথে এই মানুষগুলির আত্মিক যোগাযোগ, অবিচ্ছিন্নতা এই উপন্যাসগুলিতে প্রতিষ্ঠিত। এদের কাউকে এই অঞ্চল থেকে সরিয়ে দিলে আর সেই নির্দিষ্ট চরিত্র হিসেবে ভেবে ওঠা যায় না। ফলত ধর্মনারায়ণ বর্মার ‘মহাবীর চিলারায়’ শীর্ষক সাম্প্রতিক কালের যে স্বল্পদৈর্ঘ্যের গ্রন্থটি মুসলিম শাসকের অনাচারের উল্টো পিঠে চিলারায়কে রাখে, সেখানে আসফাক হয়ে ওঠে এমন এক চরিত্র, জল-জঙ্গল-জমি-জিরাতের সাথে বনের আদিমতা নিয়ে যে মিশে গেছে কোচবিহারের সাথে। বন ক্রমশ আধুনিকতার হাত ধ’রে পিছিয়ে যাচ্ছে (ইঙ্গিত থাকে: মানুষ আদতে নিজের

[13] এখানে সাধারণ মানুষ বলতে যা বোঝানো হচ্ছে, তাতে অভিবাসীরা রয়েছেন এবং এমন অনেকেই রয়েছেন যারা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নন।

শিকড় থেকে ক্রমশ দূরে স'রে যাচ্ছে) আর বিপন্ন হচ্ছে আসফাকের জীবন। ফলত উপন্যাসগুলি আর বিনোদনমূলক থাকে না, সমাজে প্রচলিত নির্দিষ্ট কিছু ভ্যালুজের বিপক্ষে নির্দিষ্ট মতামত হয়ে ওঠে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল কথা ছিল সার্বভৌমতা, যার মূলে ছিল একটি ভাবনা- বৈচিত্র্যময়তাকে রক্ষা করা প্রয়োজন, যা 'ভারত' নামক ধারণার ভিত্তিভূমি। কোচবিহারকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কেবলমাত্র রাজবংশীদেরই অধিকারে রাখার দাবির পিছনে যা যুক্তি ছিল, সেই যুক্তিকে দাঁড় করাতে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ইতিহাস থেকে নেওয়া। যদিও তার ব্যাখ্যা বিষয়ী-নির্ভর এবং ইতিহাসের তথ্যসূত্রে দাবির যাথার্থ্য প্রমাণের চেষ্টাও ছিল। ফলত তার বিপ্রতীপে যদি সমগ্রতার কথা বলতে হয়, বৈচিত্র্যময়তার কথা বলতে হয়, এবং গণতন্ত্র মানে যে কেবলমাত্র নিজের দাবিই নয়, সকলের দাবিকেই গুরুত্ব দেওয়া--- এই বোধটিকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়, তবে স্থানিক অতীতবোধ নিয়েই কথা বলতে হয়। তাতে মুখ্য হয়ে ওঠে এক বৃহৎ বহুস্তরীয় 'আমি', যে 'আমি' বহু 'আমি'-র যন্ত্রণা, ব্যর্থতা, সাফল্য, প্রেম, আদিমতা, বঞ্চনা--- এই সবকিছু নিয়ে গণতন্ত্রের মূল দিকটিকেই ইঙ্গিত করবে।

প্রসঙ্গত, অমিয়ভূষণের 'সাহিত্য নিবন্ধ' শীর্ষক রচনাটির (প্রবাহ তিস্তা-তোরষা শারদ সংকলন, ১৪০৭ খ্রিঃ) অংশবিশেষ উল্লেখ্য।

> অন্যত্র বলেছি ট্রমা থেকে পালানোর জন্য আমরা সাহিত্য প্রভৃতি শিল্প সৃষ্টি করি। এই ট্রমা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ মর্মপীড়া বলা যেতে পারে যার আরোগ্য না হলে মানুষ উন্মাদবৎ হতে পারে। মর্ম থেকে পালানো যায় না, তার পীড়া থেকে পালাতে চেষ্টা করা যায় বটে। এ পলায়নটা সাময়িক, দুর্যোধনের জলস্তম্ভে বিশ্রামের মতো। দুর্যোধনের কৃতকর্ম তখন নিয়তিবৎ তাকে তাড়া করেছে ফলরূপে প্রসূত হওয়ার জন্য। এই মর্মপীড়া বা মর্মন্তুদ যন্ত্রণা থেকে সাময়িক নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমরা জাগ্রতভাবে যে দিবাস্বপ্ন তৈরি করি তাই সাহিত্য। জাগ্রতভাবে স্বপ্ন নির্মাণ করার সময়ে পুরো মনটাই কাজ করে, সচেতন ও অবচেতন দুই-ই নিযুক্ত থাকে। এটা দোষের কিছু নয়। আমাদের গভীর নিদ্রার স্বপ্নেও, যার অধিকাংশই অবচেতনস্থিত মনের আত্মধারণ চেষ্টা,

> সেখানেও একজন সেন্সার করার, নিষেধ করার, বাধা দেওয়ার মতো সচেতন কিছু থাকে তা সে স্বপন সুখের কিংবা দুঃখের হোক। ...
>
> এখানে একটা সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্ন আছে। আমার নিদ্রার স্বপ্নের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করার কিছু নেই। স্বপ্নটা, যদি জেগেও মনে থাকে, কাউকে না বললেই মিটে গেল। কিন্তু সাহিত্যরূপ জাগ্রত দিবাস্বপ্নের বেলায় সে সুবিধা নেই। তার নির্মিতি লোকের চোখে পড়ে যায়, ছাপা হলে তা পণ্যও হয়ে যায়। তখন সেই দিবাস্বপ্ন সাহিত্যিকের নিজস্ব থাকে না। তাতে পণ্যের খরিদ্দারেরও, অর্থাৎ জনসমাজের অধিকার জন্মে যায়। (অমিয়ভূষণ মজুমদার ২০১৭, ৩৩৮)

উদ্বাস্তু এক মানুষ, ধর্মীয় হিংসার মুখোমুখি হওয়া এক মানুষের জীবনে কোনোদিনও আর সেই মাটিতে ফিরতে না পারাটা যথেষ্ট ট্রমাটিক। লেখকের নিজের উদ্ধৃত কথাকে গুরুত্ব দিলে উপন্যাসগুলির অতীতকল্পনাকে একটি প্রকল্প হিসেবে দেখবার ক্ষেত্রে আর কোনো দ্বিধা কাজ করে না। কোচবিহারের নিজস্ব চরিত্র প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণের যে মনোভাব উঠা আসে তাঁর কন্যার স্মৃতিচারণে, সেই চরিত্রকেই দেশভাগের পর ক্রমশ পালটে যেতে থাকা সমাজে টিকিয়ে রাখতেই এই প্রয়াস। ছেড়ে আসার, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ট্রমা কাটানোর তাগিদেই উপন্যাসগুলি যৌথভাবে এক মোটিফ বহন করে। বহুত্ব প্রতিষ্ঠা।

অমিয়ভূষণের ‘কোচবিহার সম্বন্ধে’ শীর্ষক প্রবন্ধে (বৈশাখী ৪: ১; ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮) রাজাদের কথা স্থান পেলেও আলাদা গুরুত্ব পায়নি এবং স্থানের প্রান্তিকতা স্বীকার করেও বহু মানুষই যে রাজার আমলে ভাগ্য ফেরাতে এখানে আসত, কেবল ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে এই স্থানকে আলোকপ্রাপ্ত করতে নয়, সেই তথ্যটিও জানিয়ে দেন। এখানেও আধুনিকতা প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য থাকে।

> এরকম মনে হতে পারে, এই কোচজাতীয় মানুষদের বনদূর্গের আশ্রয় থেকে যুদ্ধবিগ্রহ চালানোর যোগ্যতা থেকেই থাকতে পারে, যেমন আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান আদিবাসীদের ছিল, আর তাঁদের সভ্য করতে যেমন ইংরেজদের প্রয়োজন হয়েছিল, তেমন এই জনপদের মানুষরাও সভ্য হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ধারণাটা ঠিক হবে না। কোচ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিশ্বসিংহের রাজসভায় যে

> ইতিহাস পাওয়া যায় সেখানে সাধারণ কথাও সংস্কৃততে বলা হত, যেখানে ভাগবত এবং মহাভারত অনূদিত হয়েছিল, যে রাজসভার আশ্রয়ে, এরকম মনে করার যুক্তি আছে, প্রায়-বাংলা নাটক লেখা হয়েছিল, যে রাজার লেখা চিঠিকে বাংলা গদ্যের আদি নিদর্শন বলা হয়েছে, সেই রাজসভা আর সেই কোচ রাজবংশকে অসভ্য বলা যায় না বোধহয়। এরকমও ভাবা হয়, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ হলে এই কোচবংশ আধুনিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেরকম ভাবাটা ঠিক হয় না। কোচবিহারের উচ্চ ইংরেজি শিক্ষার স্কুল নৃপেন্দ্রনারায়ণের জন্মের আগে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। আমরা যাকে আধুনিক বলি, তা ইংরেজ সংশ্রবে জাত, বাঙালি সংশ্রব-জাত নয়। নৃপেন্দ্রনারায়ণের আগে থেকেই বাঙালিরা এই জনপদে চাকরি করতে, ভাগ্য ফেরাতে আসত, যেমন ইরানিরা আসত মোগল দিল্লীতে। সেরকম করতে আসাকে সভ্য করতে আসা বলা যায় না। (অমিয়ভূষণ মজুমদার ২০১৭, ২৬৫)

অমিয়ভূষণ যে দীর্ঘ সময়কালকে এই তিনটি উপন্যাসে ধরেছেন, তা মোটামুটিভাবে চার শতক জুড়ে বিস্তৃত। অথচ এই তিনটি উপন্যাসই রচিত স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের দশকগুলিতে। অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলি পাঠের সম্ভাবনাগুলি কী কী ছিল এবং তা কীভাবে আঞ্চলিক ইতিহাসের সাথে ডায়লগ তৈরি করছে, তা-ই এই আলোচনার প্রতিপাদ্য। ব্যক্তি অমিয়ভূষণ তাঁর উদ্বাস্তু পরিচিতির কারণে এখানে গুরুত্বপূর্ণ, বা বলা ভাল, উদ্বাস্তু অমিয়ভূষণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু এই দীর্ঘ অতীতকাল জুড়ে এই আখ্যানগুলির কাল বিস্তৃত, অতএব কোনো নির্দিষ্ট যাপন পদ্ধতির যতটা সময় লাগতে পারে আস্ত, সামগ্রিক সংস্কৃতি হয়ে উঠতে, ততটা সময় এখানে পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্নতার যে বোধটি এক অংশে প্রচলিত আছে, তার পিছনে যুক্তি হিসেবে রাখা হয়েছে অতীতকে। ভাষাকেই বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখতে চেয়ে বলা হয়েছে, এই দুই ভাষা বরাবরই পৃথক ছিল। অতীতকে বর্তমানের কোনো ক্রিয়া যথাযথ কি না, তার স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে বারবার দাঁড় করানো হয়েছে। অতীতে ছিল, অতএব বর্তমানেও তাই উচিত---এই হেন নীতিবোধ এই ভাবনার পিছনে কাজ করে খুব স্পষ্টভাবে। অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলিকেও সেই ভাবে দেখার সম্ভাবনা থাকে এবং এই আলোচনার সূত্রে সেই ভাবেই দেখতে চাইব আমরা। তিনি এই সুদীর্ঘ চারশ' বছর সময়কালকে ধ'রে বহুত্বের ভাবনাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন। তাতে এই সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, কেউ যদি

নিজের অতীতকে বর্তমানের ক্রিয়ার যুক্তি হিসেবে রাখতে চায়, সেই যুক্তি তবে হবে বহুত্বের সপক্ষে, যা গণতান্ত্রিক সার্বভৌম ভারতের বৈশিষ্ট্য। ফলত আখ্যানগুলি আসলে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কোচবিহারের নাগরিকের 'ঔচিত্যবোধ' কী তৈরি হচ্ছে, তার সাথে ডায়লগ তৈরি করে এবং বিচ্ছিন্নতাকে দূরে সরিয়ে সামগ্রিকতাকে নির্দেশ করে বারংবার, মনে করিয়ে দেয় জমি-জিরাতের উপর তার অধিকারের কথা। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হ'তে চাওয়ার প্রবণতার এক বিরুদ্ধ ভাষ্য হয়ে দাঁড়ায় এই আখ্যানগুলি, যা সন্ধান দেয় এমন এক 'আমি'-র, যা বহুস্তরীয়তার দাবি রেখে পুষ্ট করে গণতন্ত্রের ধারণাকেই, নাগরিকত্ব ব্যক্তির যে স্বীকৃতির কথা বলে, আসফাকের যন্ত্রণাও তো সেই দাবিতেই!

অমিয়ভূষণ আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের 'author'-ও বটে! 'Author' অমিয়ভূষণ এখানে মূল আলোচ্য হ'লে তা উপন্যাসের পাঠ-সম্ভাবনাকে সীমিত করে। এই অধ্যায়ের তা উদ্দেশ্য নয়। সেই যাবতীয় পাঠ-সম্ভাবনাকে স্বীকার ক'রেই আলোচ্য অধ্যায়ে দেখতে চাওয়া হয়েছে, কীভাবে দেশভাগ এবং বিচ্ছেদের ট্রমা থেকে পলায়নের, নতুন ক'রে শিকড় স্থাপনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় উপন্যাসগুলি। সেই সূত্রেই উপন্যাস-নির্দেশিত ইতিহাসের সাব্জেক্ট অমিয়ভূষণ স্বয়ং। তথ্য নয়, এই ইতিহাসে মুখ্য হয়ে ওঠে কৃষিক্ষেত্রে, পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ নিয়ে মানবতার প্রকাশ।

শিকড় স্থাপন চলছে যে অঞ্চলে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষের সেই অঞ্চলের প্রতি এক 'ownership' তৈরি হয়। সেই বোধ কার্যত তাকে বাধ্য করায় সেই অঞ্চলের প্রতি এক নৈতিক অবস্থান নিতে। উপন্যাস তিনটিকে একত্রে দেখলে, 'মধু সাধুখাঁ'-র সময়কাল-নির্দিষ্ট মূল্যবোধ 'রাজনগর' এবং 'মহিষকুড়ার উপকথা' অপেক্ষা পৃথক—এই

ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ‘মধু সাধুখাঁ’-র আমলে যে ‘আমি’ ‘অপর’-কেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করত, মহিষকুড়ার কালে তা কার্যত ‘আমি’-কেই আরও বিভক্ত করেছে, জাফরুল্লা ও আসফাক মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে শোষক ও শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। একে ইঙ্গিত না ব’লে অভিমত বলাটাই শ্রেয়। এই অভিমত গ্রহণের পিছনে থাকে দেশভাগের ট্রমা। তা কাটাতেই এই অভিমত যেন অমিয়ভূষণ বর্ণিত সেই ‘দিবাস্বপ্ন’।

উপসংহার

বাথান বাথান করেন মৈষাল, বাথান করলেন বাড়ি

যুবা নারী ঘরে থুইয়া কে করে চাকিরি মৈষাল।।

তোর বাথান দেখং আউলা ঝাউলা রে-- বাথান ভরা গোবর

খান, দান, চাকিরি করেন, বাড়ির নাই তোর খবর মৈষাল রে।।

চাকরি ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো রে ঘুরিয়া আসেক বাড়ি

গলার হার বেচিয়া দিম মুই ওই চাকিরির কড়ি মৈষাল।।

উজান করলেন মেঘমেঘালি রে কি ও মইশাল দখিন খাইলেন বানে

এমন ধনীর চাকরি করেন, বিদায় না দ্যান্ কেনে মৈষাল।।

এই গবেষণাপত্রের ভবিষ্যত সম্ভাবনার দু'টি অভিমুখ রয়েছে। গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি, কীভাবে বাজারব্যবস্থা পাল্টানোর সাথে সাথে, ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের ধরণ পাল্টানোর সাথে সাথে 'আমি'-র বোধও বিবর্তিত হয়। অতীত অনুসন্ধানে সেই বিবর্তনের সমালোচনা ও একটি পক্ষ নির্দেশ কীভাবে উপন্যাস তিনটিতে এসেছে, যা ইতিহাসের রৈখিকতাকে অস্বীকার করে, তা আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ব্যক্তি অমিয়ভূষণকে নিয়ে। ব্যক্তি অমিয়ভূষণ মানে- তিনি কী পোষাক পরতেন, কী খেতে ভালবাসতেন— এইসব নয়, বলাই বাহুল্য। উদ্বাস্তু মানুষের শিকড় সন্ধানের যে ইতিহাস, তার বিষয়ী (subject) হিসেবেই তিনি এই আলোচনার কেন্দ্রে। এই অধ্যায়ে দেখতে চেয়েছি দেশভাগের পর কোচবিহারের সাথে তাঁর শিকড় স্থাপনের সম্পর্কটি কীভাবে গড়ে উঠেছে, যার মধ্য দিয়ে উপন্যাসগুলিকে কোচবিহারের পরবর্তীকালের সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি প্রসঙ্গে অভিমত ও নির্দিষ্ট পক্ষ গ্রহণ হিসেবে পাঠ করা যায়।

এ'বারে দ্বিতীয় অভিমুখটির কথায় আসা যাক। উদ্বাস্তু ও অভিবাসীর সাহিত্যকে নতুন শিকড় স্থাপনের সাহিত্য হিসেবে পাঠের সম্ভাবনা। উপসংহারের সূচনায় উদ্ধৃত পংক্তিটি অসমের গোয়ালপাড়ার প্রচলিত ভাওয়াইয়া গান। মোষ এবং সেই সূত্রেই বাথান ও মৈষাল কামতা অঞ্চলের পরিচিত অংশ। বহু গানেই ঘুরে ফিরে এসেছে মৈষালের প্রসঙ্গ, সবক্ষেত্রেই সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই। এই নির্দিষ্ট গানটির একটি পূর্বকাহিনীও রয়েছে। কালী দাশগুপ্ত সেই কাহিনীটি বলেছেন এভাবে। মৈষাল নিজের বিয়ের সময় প্রথা অনুযায়ী কন্যাপণের ব্যবস্থা করে। সে তার মালিকের অধীনে পরবর্তী এক বছর বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম দান করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার কাছ থেকে সেই অর্থ ধার হিসেবে নেয়। এবারে বিয়ের পর সেই যে সে ধার মেটাতে যায়, আর ফিরে আসা হয় না তার। এদিকে নববধূ অপেক্ষায় কাতর হয়। সেই কাতর বধূর আকুতি এই গান। 'মহিষকুড়ার উপকথা'-তেও ঠিক অনুরূপ একটি যাত্রা আছে। মৈষাল আসফাকের জাফরুল্লার অধীনে থেকে যাওয়া ও কমরুনের অপেক্ষা। এবং লক্ষ্যণীয়, মধু আর বিবিসাহেবের যাত্রা কিংবা রাজচন্দ্র আর নয়নতারার যাত্রাও এই রকমই। তবে উপন্যাসগুলির কোনোটিতেই তারা স্বামী-স্ত্রী নয়। উপরিউক্ত গানটি থেকে এই কথাও অনুমেয়, মৈষালকে সম্বোধন করা গান একটি অঞ্চলে বহুসংখ্যায় প্রচলিত হিসেবে থাকলে আসফাকের মতো চরিত্র ঠিক কতটা গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষমরা রাখে! এই অনুমান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ জমি-জিরাত হারানোর যন্ত্রণায় যে আসফাক মোষ হয়ে উঠতে চায়, সে অধিকাংশ মানুষেরই 'আমি'-র বোধ নির্মাণে, মৈষাল হওয়ার সূত্রেই, বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা রাখে!

নতুন ক'রে শিকড় প্রতিষ্ঠা মানেই গুরুত্ব পায় নতুন পরিচিতি ও সেই নতুন পরিচিতি নির্মাণের পিছনে কাজ ক'রে চলা রাজনীতি। স্মৃতির প্রসঙ্গ এখানে আসে পুরনো শিকড়ের অনুষঙ্গে কিংবা ট্রমার অনুষঙ্গে। কিন্তু উদ্দেশ্য এখানে অস্তির দিকে যাত্রা করা, মাটি হারিয়ে যে 'আমি' অস্বীকৃত হয়েছে, নতুন পথে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া, এক দীর্ঘ

অতীতবোধকে কাজে লাগিয়ে নতুন-এই-নির্মিয়মান-শিকড়ে নিজের অধিকার সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বিস্তার। ফলত আসফাক তার শ্রেণি-ধর্ম নিয়ে সেই 'আমি'-র অন্তর্ভুক্ত হয়, মধু, রাজচন্দ্র, বাগচী, হরদয়াল--- এরা সবাই তার পূর্ববর্তীকালে যে 'আমি'-কে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এরা প্রত্যেকে এই 'আমি'-র অন্তর্ভুক্ত হয় মাটির সাথে তাদের সম্পর্কের সূত্রে, হরিণ শিকার ও প্রেমাষ্পদের সাথে মধু-রাজু-আসফাকের সম্পর্কও তাদের এক সূত্রে বাঁধে।

মধু খুঁজে চলে নদীর দুই ধারে তার পিতার সমাধিস্থানকে, যা সে কখনোই খুঁজে পাবে না—সে জানে। তবু নিজের মৃত্যুচিন্তার সূত্রে সে এই উপলব্ধিতে আসে, সে না থাকলেও তার ছেলে থাকবে, তার নাতি-নাতনি থাকবে। এক খুঁতি তামাকের বীজ দিয়ে যেরকম সারা পৃথিবী ভরিয়ে দেওয়া যায়, এ-ও একভাবে থেকে যাওয়া। পাশাপাশি এখানেও সেই ট্রমা এবং অস্তির দিকে যাত্রা।

আলোচ্য তিনটি উপন্যাসের সময়কালের নিরিখে সব শেষে মহিষকুড়ার প্রসঙ্গ আসে। এই উপন্যাস শেষ হয় ফিরতে না পারার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে। যেহেতু মহিষকুড়ার উপকথাকে এখানে একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে দ্যাখা হচ্ছে, সেহেতু প্রকল্পটিও শেষ হয় সেই যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই। দেশভাগ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সাহিত্যই মোটের উপর সেই কথা বলে। শিকড়ে ফিরতে চাওয়ার আকুতি, দূরবর্তী অবস্থানে থেকেও সেই শিকড়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা এবং তার মধ্য দিয়েই 'dislocation'-কে চিহ্নিত করা--- এই সমস্তকিছুই বহুল আলোচিত। অমিয়ভূষণের উপন্যাসগুলির নিজস্বতা সেখানে নয়। এই উপন্যাসগুলিতে লিখিত ইতিহাসের সাথে ক্রমাগত ডায়লগ

তৈরির মাধ্যমে আসলে ‘আমি’-র নতুন পরিচিতির সন্ধান থাকে। সেই সূত্রেই নতুন ক’রে শিকড় স্থাপনের নজির হয়ে ওঠে এই উপন্যাসগুলি।

দেশভাগের পরে নতুন জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য নিয়ে, যারা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্গত ছিল না। ফলত যারা দেশীয় রাজ্য থেকে আগত এবং যারা ব্রিটিশ ভারত থেকে আগত, তাদেরকে সব দিক থেকে এক ক’রে দেখার চেষ্টা হ’ল, কারণ এবারে সবটা মিলিয়ে এক অখন্ড জাতি। কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যময় অবস্থানের সম্ভাবনাও তো কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত হ’ল। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ যে কারণে এত জটিল, সমস্যাসংকুল, এই কারণটি তার মধ্যে অন্যতম। অমিয়ভূষণ মজুমদারের আলোচ্য উপন্যাসগুলি সেখানে সি রকমই একটি দেশীয় রাজ্যের চরিত্র নিয়ে কথা বলে। সেই সূত্রেই আলোচ্য গবেষণাপত্র থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস, জাতীয়তাবোধ, পক্ষ নির্ধারণ--- এই সবকিছু বুঝবার ও ভারতবর্ষের জটিল চরিত্রের পিছনে থাকা জটগুলিকে ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যান্য গবেষণার সম্ভাবনা সূত্র নির্দেশ করে। এটি হ’ল সম্ভাবনার একটি অভিমুখ।

শিকড় স্থাপনের পাশাপাশি দায়িত্ববোধ তৈরি হয়, যা আসে অংশিদারিত্ব থেকে। উদ্বাস্তুরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন। অর্থাৎ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ভিন্ন অভিজ্ঞতাও তাঁদের ছিল। দেশভাগের সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের প্রসঙ্গটি প্রাধান্য পেলেও নতুন শিকড় সন্ধান বা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম গুরুত্ব পেয়ে আসেনি। কীভাবে এক মানুষ তার উদ্বাস্তু পরিচিতি নিয়ে, দেশভাগ, শিকড়-বিচ্ছিন্নতার ট্রমাকে ভুলতে চায়, কীভাবে ক্রমাগত ডায়লগ চলে নতুন স্থানের অতীতের সাথে এবং সেই সূত্রেই দীর্ঘ সময়ের ঘটনার অভিজ্ঞতাসিক্ত হওয়া ‘আমি’ সেই স্থানকে

নিজের শিকড় হিসেবে গ'ড়ে তুলবার মানসিক ভিত্তি দৃঢ় করে, তার যে রূপরেখাটি এই গবেষণাপত্রে দেখানো হ'ল, তা পরবর্তীতে দেশভাগের সাহিত্যকে নতুনভাবে পাঠ করার সম্ভাবনাসূত্র দিলে এই গবেষণা সার্থকতা খুঁজে পাবে সেখানেই।

গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা গ্রন্থসমুহ:

ঘোষ, শৌরীন্দ্রকুমার. ১৯৫৬. বাঙালি জাতি পরিচয়. কলকাতা: সাহিত্যলোক.

দাস, নির্মল. ২০০১. উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ. কলকাতা: সাহিত্যবিহার.

দাস, ড. পম্পা. ২০০৫. মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য. কলকাতা: রেণু প্রকাশনী.

নাগ, রমাপ্রসাদ. ২০০২. স্বতন্ত্র নির্মিতি: অমিয়ভূষণ সাহিত্য. কলকাতা: পুস্তক বিপণী.

- ২০০৮. অমিয়ভূষণ: ট্রমাচিহ্নিত এপিক. কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী.

পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ. ২০০০. ইতিকথায় কোচবিহার. কলকাতা: অণিমা প্রকাশনী.

বন্দ্যোপাধ্যায়, ভগবতীচরণ. ২০০৬. কোচবিহারের ইতিহাস. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ. ১৯৯৬. বাংলা উপন্যাস: দ্বান্দ্বিক দর্পন. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি.

বর্মা, ধর্মনারায়ণ. ২০১২. মহাবীর চিলারায়. কুচবিহার: মহারাজ নরনারায়ণ চিলারায় ট্রাস্ট.

ভট্টাচার্য, দেবাশিষ. ২০১৩. বিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্য: নিম্নবর্গীয় চেতনা. ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশান্‌স.

ভট্টাচার্য, বীতশোক. ২০০৪. কথাজিজ্ঞাসা. কলকাতা: এবং মুশায়েরা.

মজুমদার, অমিয়ভুষণ. ১৯৮৮. মধু সাধুখাঁ. কলকাতা: বাণীশিল্প.

- ১৯৯৪. রাজনগর. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

- ১৯৮১. মহিষকুড়ার উপকথা ও একটি খামারের গল্প. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

- ২০১৭. প্রবন্ধ সংগ্রহ. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

- ২০০৩. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ২য় খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০০৫. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৩য় খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০০৭. 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৪র্থ খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০০৭. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৫ম খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০০৮. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৬ষ্ঠ খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০০৯. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৭ম খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০১০. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৮ম খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০১০. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ৯ম খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

- ২০১২. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র. ১০ম খন্ড. কলকাতা: দে'জ পাবিলিশিং.

মজুমদার, এণাক্ষী. ২০১৭. বনেচর: অমিয়ভুষণ মজুমদারের জীবনকথা. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং.

রায়, তীর্থংকর. ২০১৩. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস. কলকাতা: আনন্দ.

রায়, দেবেশ. ২০০৩. অপর ভাষা. ত্রিপুরা: অক্ষর পাবলিকেশান্‌স.

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থসমুহ:

Agamben, Georgio. 1990. The Coming Community. Minnesota: University of Minnesota Press.

Anderson, Benedict. 1983. Imagined Communities. London: Verso.

Bowie, Andrew. 2003. Aesthetics and Subjectivity: From Kant to Nietzsche. 2nd ed. Manchester and New York: Manchester University.

Carr, E. H. 1964. What is History?. New York: Penguin.

Chakravorty Spivak, Gayatri. 2015. Nationalism and the Imagination. Calcutta: Seagull Books.

Chatterjee, Partha. 2004. The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World. New Delhi: Permanent Black.

Eagleton, Terry. 1996. Literary Theory: An Introduction. 2nd ed. Minneapolis, The University of Minnesota Press.

Fanon, Frantz. 2004. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

Lear, Jonathan. 1998. Open minded: Working Out the Logic of the Soul. Cambridge: Harvard University Press.

Nancy, Jean-Luc. 1991. The Inoperative community. Minneapolis: University of Minnesota Press.

ইন্টারনেট-প্রাপ্ত প্রবন্ধ:

Benjamin, Walter. 1974. ‘On the Concept of History’. http://www.marxists.org/reference/archive/benjamin/1940/history.htm (Accessed 12 May 2019).

ইউটিউব লিঙ্ক:

Bathan Bathan koren moishal Interview. 2012. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Tip1d1oLuLo (Accessed 13 May 2019).